প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৬০

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১১৩ই কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রাকর
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬




একশো
ছড়া

ভূমিকা

আমাব নিজেব ছডা লেখা শুরু হয়েছিল এইভাবে—'এক পয়সায় একটি' সিরিজেব জন্য বুদ্ধদেব বসু ষোলটা কবিতা চেয়েছিলেন। তখন ছড়া পড়তুম। ইংরেজি ক্লেবিহিউ, লিমেরিক, কথলেস বাইম, ব্যালাড। ছডা লিখতুম না। আমার কাছে আদর্শ ছডা ছিল 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুডালো', 'হাট্টিমা টিম টিম'—এই সব। একদিকে খাঁটি লোক-সংস্কৃতি, মুখে মুখে যা ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষানুক্রমিক যা সঞ্চাবিত হয়। এ সব ছড়া কাব লেখা, কবে বানানো কেউ জানে না। আব একদিকে হিউমাবাস বা ননসেন্স কিছু। তখন ছড়া পডতাম। বুদ্ধদেববাবুব তাগিদে হঠাৎ কিছু ছড়া তৈবী হয়ে গেল। কবিতার মত ছড়ার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, ছড়া বানাবার। ছডা হয় আকস্মিক, ইবরেগুলাব। সেখানে আর্ট আছে, আবটিফি-সিয়ালিটিব স্থান নেই।

জনসাধারণের কাছ থেকে আমি কতকিছু নিচ্ছি, অনেককিছু পাচ্ছি, তার বদলে তাদের দিচ্ছি কি? কিছু না। ফলে তাদের উপযুক্ত করে কিছু দেওয়াব জন্য একপ্রকার জনসাহিত্যের মত আমি ছড়াকে নিলাম। এমন লেখা যা সেলফ্‌কন্‌শাস্‌ না হয়ে পডে। যা পড়ার দবকার নেই, শুনলেই সবাই বোঝে, বুঝতে পাবে। যাদের আমবা অশিক্ষিত, সাদামাটা ভাবি তাদের কাছেই আমার অনেক শেখার আছে। লোকছড়ায় কতদিনের অভিজ্ঞতা, ফোক্

উইস্‌ডম ধরা থাকে, এ ছাড়া নানান্ সম্প্রদায়ের ছড়ায় এথ্‌নিক ব্যাপারও থাকে। আধুনিক ব্যঙ্গ বা সূক্ষ্ম কল্পনার চেয়ে আমি চেয়েছিলুম ছড়ার মধ্য দিয়ে ওই সাধারণদের জন্য বলতে। সব সময় পারিনি। আমার ছড়াও কখনো সফিস্‌টিকেটেড হয়ে গেছে।

ছড়া হবে ইররেগুলার, হয়তো একটু আন্‌ইভেন। বাকপটুতা, কারিকুরি নয়। কবিতা থেকে ছড়া আলাদা। ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যাপ্ত করে নিতে হয়। কবিতা তো যে কোনো ভাবেই হয়, যে কোনো ছন্দে, এমনকি গদ্যেও। ছড়ার কিন্তু একটাই ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ছড়ার ছন্দ, একটু দুলকি চালে চলে, শাস্ত্রসম্মত নামও একটা আছে তার। ছড়া ঐ ছন্দেই লেখা যায় শুধু। আমিও ওতেই লিখেছি। হয়তো কোথাও কোথাও অন্যরকম করেছি, কিন্তু আসল ছন্দটা ওই। আর ছড়ার মিল। দু সিলেবল হবেই, তিন সিলেবল হলে আরও ভালো হয়। আর শেষে কোন যুক্তাক্ষর থাকবে না। এসব অনেকে এখন মানেন না, এক সিলেবল মিল দিয়ে ছেড়ে দেন, ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের মিল, ফাঁকিবাজি। ইংরেজি ছড়ায় দেখেছি শব্দ কখনো কখনো পুরোটা উচ্চারণ না করে অংশত লিখে ছেড়ে দেয়। বাংলা ছড়াতেও এটা এখন আসছে।

ভাব ও ছন্দ তো থাকবেই, এছাড়াও ছড়ার থাকবে ইমেজ ও মিল। ছড়ার ইমেজ মিল রেখে আসে না, পারম্পর্য কম। হাট্টিমা টিম টিম/তারা মাঠে পাড়ে ডিম/তাদের খাড়া দুটো শিং—শিং দিয়ে মিলিয়ে দেয়া হল। কমলাপুলির টিয়েটা/সুয্যিমামার বিয়েটা—ইমেজ আসছে হঠাৎ হঠাৎ। ছড়ার ঐতিহ্য অনেকদিনের, বহু পুরাতনের স্পিরিট, কিন্তু ছড়া নিয়মিত লেখার প্রচলনটা সম্প্রতি হয়েছে, গত তিরিশ চল্লিশ বছরে। এর সম্ভাবনা তো অসীম, অনেক কিছু করা যায়। ছড়া হলেই হালকা, সরস হবে তা কেন? সব কিছু নিয়েই ছড়া হয়েছে, বীভৎস রস নিয়েও হয়েছে। ধাঁধা প্রবচন লোকগীতি গাথা—সবই তো সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে না, আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। ছড়া যদি জনসাধারণ নেয়; শুধু আমি বা আমরা কয়েকজন ছড়া লিখবো তা আমি কোনদিনই চাই না, সবাই লিখুক, অনেকে লিখুক, তার মধ্যেই কিছু ছড়া বেঁচে থাকবে; তাহলেই ছড়ার, ছড়ার ফর্মের সার্‌ভাইভ্যাল সম্ভব। নয়তো শুধু কয়েকজনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় আর কি হবে!

তবে এটাতো আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। চেহারায় পোষাকে আচরণে সকলে প্রায় একরকম হলেও শিল্পে, সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। তাই আধুনিক ছড়ায় লোকছড়ার কালেক্‌টিভ সেন্সটা আর নেই। আজ প্রত্যেকের লেখার একটা নিজস্ব ঢং এসেছে। মিল, ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকের এক এক রকম। আমারটা পড়লে বোঝা যায় এটা আমার ছড়া। আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়লে বোঝা যায় এটা কার ছড়া। একশো দুশো পাঁচশো বছর আগে সীরিয়াস কবি/লেখকরা ছড়া লিখতেন না, যারা ছড়া বানাতো—মেয়েরা চাষীরা শিশুরা—তাদের নাম কেউ জানে না। আজ সীরিয়াস লোকেরাও ছড়া লিখছেন। ছড়ার মধ্যে সত্যি কিছু না থাকলে এটা হত না। তবে সব ছড়াই তো আর ছড়া নয়, বেশীর ভাগই পদ্য।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছড়া দিলাম ছড়িয়ে
সেই ছড়া যায় গড়িয়ে

প্রাসঙ্গিক

ছড়া আসলে এই ছড়িয়ে যাওয়ার জিনিশ যা মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে যায়, মন থেকে মনে ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃত 'ছটা' থেকে এসেছে বাংলা 'ছড়া'— শব্দচ্ছটা ছন্দে ছড়ানো, এই সংজ্ঞায় ছড়ার কাণ্ডটিকে শুধু ধরা যাবে। বাকি থাকবে ডাল আর পাতা, ফুল ফল আর কুঁড়ি ; আর ছায়া। সুরেলা ধ্বনিই ছিল ছড়ার প্রাণ, 'ছড়া গান' শব্দের ব্যবহারে বোঝা যেত গানের সাথে তার সম্পর্ক ছিল নিবিড়, গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর কাব্যে ছুটকো বিক্ষিপ্ত ছন্দময় রচনা, ছড়া ছিল এই।

অতীতে ছড়া ছিল স্মৃতিনির্ভর, পুরুষানুক্রমিক-সঞ্চারী। তার সৃষ্টি ও চর্চা, বিস্তার ও বিচার ছিল ইন্‌ফর্মাল। ছড়া লেখার বহুল প্রচলন ও সচেতন হয়ে ছড়া লেখার অভ্যাস সাম্প্রতিক, বিগত কয়েক দশকের। তবু ছড়া লিখছি-না ভেবেও পঞ্চাশ, একশো, দুশো, তিনশো, চারশো, পাঁচশো বছর আগেও দীর্ঘ লেখার অংশবিশেষে, হয়ত অচেতন বা অজ্ঞাতভাবেই, এমন কিছু বিশেষত্ব এসে গেছে, রয়েছে, যা ছড়ার এক বা একাধিক বিশেষণের সঙ্গে যায়। নির্দ্বিধায় যায়। যা ছিল ছড়ার প্রস্তুতিপর্ব।

আধুনিক সময়ে এসে ছড়া এখন ছড়া বলে লেখা হচ্ছে, আকারে ছোট করে লেখা হচ্ছে, একদিকে যেমন সচেতন পরীক্ষা নিরীক্ষায় হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি কবি/লেখক যে কথা অন্যভাবে বলছেন না, বলতে পারছেন না, ছড়া তাঁকে দিয়ে ছড়ায় তা বলিয়ে নিচ্ছে। অত্যন্ত রাশভারী মানুষটিও যেমন পার্টি পিকনিক বা অন্য কোন প্রমোদ অনুষ্ঠানে আচার আচরণ ও হাবভাবে স্বভাববিরুদ্ধ এমন অনেক কিছু করে থাকেন যা অন্য সময়ে করলে ভীষণ খেলো মনে হত, ও ছেলেমানুষি ; খুব গুরুগম্ভীর আর গুরুত্বপূর্ণ মানুষটিও যেমন ঘরে ফিরে এসে মনের মানুষের কাছে কত খোলামেলা হয়ে যান আর অন্তরঙ্গ ; ছুটির দিনে দৈনিক রুটিনে যেমন স্বেচ্ছায় এমন অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে যায় যা অন্যদিনে ঘটলে হয়ে উঠত স্বেচ্ছাচার, বিশৃঙ্খলা ; ছড়াও আসলে তেমনি ওই ছুটির দিনের জিনিশ, ভিতর ঘরের জিনিশ, ছড়ার নাম প্রমোদন। স্বাভাবিক, সার্থক ছড়াকাররা প্রায়ই অন্য কোন বিষয়ে সচেতন লেখক, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, সফিস্‌টিকেটেড।

ফলে সমস্ত সত্ত্বেও প্রেম ও ভালোবাসার মত ছড়া বানানোও আজও ইন্‌ফর্মাল, অনেকটাই সহজাত। আর তার যে কত বিচিত্র রূপ ও রস ! কখনো তা কবিতার মত—ব্রত ভাসাও জলে, কন্যা/ব্রত ভাসাও জলে ;

তোমার মুখ আগুন, কন্যা/পাড়ার লোকে বলে।[১]

কখনো গানের মত—লিয়ানা গো লিয়ানা/সোনার মেয়ে তুই

কোন্ পাহাড়ে তুলতে গেলি/গন্ধভরা যুঁই ?[২]

কখনো শ্লোকের মত—সুবচনী কুচবরণী ফুল ছড়ানো গা'

মাটির মায়া জলে ভাসে আগুনে ফেলে পা।[৩]

কখনো ধাঁধাঁর মত—বকুল বকুল বকুল/বৃন্দাবন গোকুল

একে চন্দ্র তিনে নেত্র/কাশী আর কুরুক্ষেত্র।[৪]

দূরান্বিত পাঠকের যে প্রসঙ্গে হয়ত মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের—

পায়ে ধরে সাধা। /রা নাহি দেয় রাধা ॥

শেষে দিল রা,/পাগোল ছাড়ো পা ॥

কখনো 'মত' শব্দের ব্যবহারও বাহুল্য হবে। ছড়া তখন সরাসরিই গান হয়ে উঠবে, পুরোপুরিই ধাঁধাঁ—প্রথম ভাগে উল্টে মর/জীবন পাবে পরে

আজ থেকে সব উপোস কর/মুসলমানের ঘরে।[৫]

ভালোবাসা যেমন শুধু মনে বা শুধু শরীরে নয়, দুয়ের এক অদ্ভুত মিশ্রণ, ছড়ার

মজা ও মেজাজ, কৌতুক ও আমেজ, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতিও তেমনই তির্যক, দ্বান্দ্বিক। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায় একই প্রসঙ্গ-ও পদ্ধতি-হীনতা। দুয়েই অসংগতির একই সৌন্দর্য। অত ছড়ানো তবু কত গোছালো। ভালোবাসা যেমন অনেককে এক ও এককে অনেক করে দেখে, বৃহৎকে তুচ্ছ ও তুচ্ছকে বৃহৎ করে ধরে, ছড়া, ছড়াও তাই। সামান্যকে সামান্য বলে উড়িয়ে না দেবার অসামান্য গুণে ছড়া গুণময়।

আর তা বহুলাংশে সর্বজনীন। সংখ্যার নামতা কেটে ছড়া আমাদের যেমন আছে, ওদেরও আছে। শুধু ওদেরটা আর একটু সফিস্‌টিকেটেড—One for sorrow/Two for joy/Three for a letter/Four for a boy/ Five for silver/Six for gold/Seven for a secret/never to be told./Eight for a letter from over the sea/Nine for a lover as true as can be.

নতুন ছড়াই বা কেন, একই ছড়া আবার একখান থেকে আরেকখানে গিয়ে আরেক রকম হয়ে পড়ে। পশ্চিমবাংলায় যা ছিল—

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবে শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥

বাংলাদেশে গিয়ে তাইই হয়—আমলামতি সরস্বতী কাল আমলার বিয়ে
আমলাকে নিয়ে গেল ময়নাতলা দিয়ে।

কাল আমলার বিয়ে আর আমলাকে নিয়ে গেল, দুই ভিন্ন tense-এর এই যে সহাবস্থান তাও কম সফিস্‌টিকেশন নয়। কোন না কোন ভাবে তা থাকবেই। থাকে বলেই য়ুলিসিসের মত জটিল গ্রন্থের রচয়িতা জেমস জয়েস তারই আর এক গ্রন্থে সার্থক ছড়া লিখে রেখে যান। 'কখনো সময় পেলে কিছু ছড়া লিখব', হেমিংওয়ে লিখেছিলেন। সময় তিনি পান নি। জয়েস পেয়েছিলেন, জয়েস লিখেছিলেন। হেমিংওয়ের লেখা হয়নি, কিন্তু লেখার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিম্বা অত দূর পর্যন্ত তাকানোই বা কেন, চার বছর বয়সে যে শিশুটি লেখে—

হুস করে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলাম/কাকটা উড়ে গেল

সাত বছর বয়সে এসে সেই লেখে—

পথে যেতে যেতে/মুড়ি খেতে খেতে
ছুঁড়ে মারি ঢিল/উড়ে গেল চিল[৬]

এই যে এখন ঢিল ছুঁড়ে মারলে কাক না উড়ে গিয়ে চিল উড়ে যায় তা ছন্দের প্রয়োজনে, একেই বলব, সফিস্‌টিকেশন। সরলীকরণ ও সমীকরণের বিরুদ্ধে যে তির্যক বিদ্রোহ সমস্ত ছড়ায় শিল্পমেজাজে তা নিতান্ত আধুনিক।

বলা হয়, ছড়ায় থাকবে সংলগ্ন/অসংলগ্ন কয়েকটি ভাব, সেখানে ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা তত জরুরি নয়; কথার মধ্য দিয়ে যে রূপ তাও হবে টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কথার ছবি, তাই ভাব কিম্বা রূপের চেয়ে রসের মূল্য বেশি ছড়াতে। সহজ কথা সহজ কথায় লিখে কি গভীর কথা সহজ কথায় লিখে ছড়া। তার শব্দছন্দ ও বাক্যবন্ধ, দোলা ও ব্যঞ্জনা, অলংকার ও চিত্রকল্প, সমাজচেতনা ও মূল্যবোধ, গল্পের উপস্থিতি ও বিমূর্ত ভাবনা এই প্রাসঙ্গিকের আলোচ্য নয়। পরিশিষ্টে সংযোজিত ছড়ার আঙ্গিক-বিষয়ে লেখাটিতে সেসব খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে বিচার্য শুধু ছড়ার সেন্স। ছড়া যেখানে জন-সাহিত্যের অংশ সেখানে তা ব্যষ্টির সৃষ্টি। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হওয়া অবধি ভালোবাসা যেমন নাম আর ঘর পায় না, এও তাই। ছড়ার কাঠামোয় নিজের ছাঁচ ঢেলে এক এক ছড়াকার তাঁর ছড়া গড়ে তোলেন। ভালোবাসার ভঙ্গিমা যেমন লোক থেকে লোকে আলাদা, গড়ে তোলা এই সব ছড়াও তেমনি কবিতে কবিতে ভিন্ন। কেউ স্বরবৃত্তেই খুশি, কারও মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তেও ঘুরে আসা চাই; কেউ বহিরঙ্গে মাতেন, কেউ ভিতর অবধি দেখে নেন; কারও অল্প মিলেই তৃপ্তি, কারও গানের ধুয়োর মত কেন্দ্রীয় মোটিফকে বারে বারে বাজানো! কখনো ননসেন্স কখনো আপাতগম্ভীর। কখনো গুন্‌গুন্‌ কখনো সশব্দ। কখনো নিষ্ক্রিয় কখনো ক্রিয়াশীল। তবু ভঙ্গিমার মিলও থেকে যায়। তাই পুরোনো ছড়াই নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসে নতুন ছড়ায়—এই যে, কলমিলতা,/এতোকাল ছিলেন কোথায়?/ কোথায় আর, নানান টানা/কাজেতে আটকেছিলাম: /টানলো কচুরিপানায়,/ জানা নেই, বাংলা দিঘি/জলের ওই জানলা-কটা/ডেকে নেয়: তোমার কী নাম…/এ কথার একটু আগে/এই আমি, কলমিলতা,/হারালাম কী এক ফাঁকে।[৭]

একই ছড়া দুজনের লেখায় দুরকম রূপ নিয়ে আসে। কেউ লেখেন—

মনে থাকে মা আমার, ঘরে থাকে বউ
জেগে ওঠে শেয়ালেরা হো হো হো।[৮]

কেউ লেখেন—মন থেকে ঘরে এল বৌ
ও বৌয়ের ভালো নাম ঔ।[৯]

শুধু বউ নয়, সন্তানের কথাও আসে ছড়ায়—

ধন ধন ধন,/বাড়ীতে ফুলের বন।
এ ধন যার ঘরে নাই তার কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে?/আগুনে পুড়ে কেন না মরে?

এইভাবে, যা সকলেই জানে মনের মানুষের জন্য তাই নিতান্ত আপন ও একান্ত গোপন হয়ে থাকে। অলংকার বাহুল্য হয় তখন, আবরণের তত প্রয়োজন থাকে না। ছড়া এইরকম খোলামেলা ও সোজাসুজি, সাদামাটা ও আটপৌরে, ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ।

তাতে মন আর ঘর, ঘর আর বাব একাকার হয়ে যায়। মা আর বউ, বোন আর মেয়ে পাশাপাশি থাকে। জল যেমন জলে এসে মেশে, কোন দাগ রেখে মেশে না; ঘুমের ভিতরের ঘুম থেকে জাগা যেমন ঘুমের ভিতরের ঘুমে ঢলে পড়াই, ছড়া আর ছড়া-নার চৌকাঠটিও তেমনই ছায়াচ্ছন্ন। শেষ দুটি ছড়া তাই, বাধ্যতামূলকভাবে তাই, ঘুম নিয়ে। কেননা কবিকর্মে ঘুমকে ছায়াচ্ছন্ন মানবীরূপে কল্পনার প্রয়াস বহুদিনের। একজনের সমস্ত ছড়াই তাই শেষ পর্যন্ত মত্ততা আর অভিমান, দুঃখ আর মাধুর্যের ওই বিশেষ একজনকে নিয়েই—

মাদল বাজে উল্‌গুলান কত ছড়া গড়ি গো
এই ছড়া ওই ছড়া সব ছড়া তোরই গো
মাদল বাজে উল্‌গুলান

ধীমান দাশগুপ্ত

---

(১) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২) আল মাহমুদ (৩) পরমানন্দ সরস্বতী (৪) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (৫) সত্যজিৎ রায় (৬) শ্রাবণী সরকার (৭) বীতশোক ভট্টাচার্য (৮) বীতশোক ভট্টাচার্য (৯) ধীমান দাশগুপ্ত। এই বইয়ের ছড়া সংগ্রহে সাহায্য করায় রত্নাংশু বর্গীকে ধন্যবাদ।

পটভূমি : ছড়ার প্রস্তুতিপর্ব

কাহ্ন

চর্যাগান

অলি এঁ কালি এঁ বাট৷ রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা॥
কাহ্ন কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মণগোঅর সো উআস॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্ন ভব পরিচ্ছিন্না।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগ বনে কাহ্ন বিমন ভইলা॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ী জিনউর বসই।
ভণই কাহ্ন মো হিঅহি ণ পইসই॥



অনুবাদ

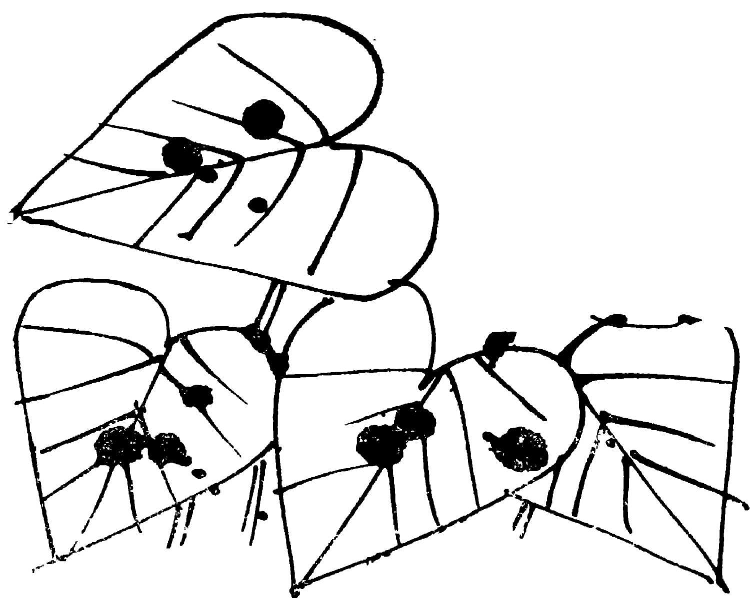
আ ই এ ও ব র হ ল
শ্বাস নিলে ; পথ বেঁধে আলি এসে দাঁড়ালো।
ক চ ট ত প থ ধ ন
শ্বাস ফেলো ; পথ বেঁধে কালি এসে দাঁড়ানো।
কাহ্নির মন নেই, কাহ্নু উন্মন :
কোথায় সে বাস করে শ্বাস ফেলে সে এখন !
বয়ে যায় যা উদাস ; সন্ধ্যা ও রাত দিন :
এই তিন সেই তিন তিন বাদ যোগ তিন।
ভিন্ন কি তবে তিন কায় বাক্‌চিত্ত —
যে যে এলো, চলে গেলো : মন বুঝি টিকতো !
জিনপুরে ব'সে তাই কাহ্নের ভণিতা :
কেন সিঁড়ি, আনাগোনা — ঢুকছে না মনে তা।

বীতশোক ভট্টাচার্য

কানা হরিদত্ত

পদ্মার সর্পসজ্জা

দুই হাতে শঙ্খ হৈল গরল শঙ্খিনী।
কেশের গাত কৈল এ কালনাগিনী ॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি ॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়
চন্দ্রসূর্য দুই তারা আড়ে লুকায় ॥



বিজয় গুপ্ত

গোটা কতক কচুর পাতা
সুমিত্রা গো মশামাছির মাথা
আফুলা চালতার গো মূল,
কনক ধুতুরার ফুল ॥
মামা ভাগ্নে চষে হাল,
কাঁধে নিয়ে ভাঙা জোয়াল,
বাঁরের বুরর তলের মাটি।
আর আন্দলের লাঠি ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ
চৈতন্য চরিতামৃত

কৃষ্ণপ্রেম সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥
এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
জিভ জ্বলে না যায় ত্যজন।
হেন প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥



দ্বিজ মাধব

সারদামঙ্গল

শুনিয়া যে বীরবর কোপে কাঁপে থরথর,
শুন রামা আমার উত্তর।
করে লৈয়া শর গাণ্ডী পূজিব মঙ্গলচণ্ডী,
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর॥
যতেক দেখহ অশ্ব সকলি করিব ভস্ম,
কুঞ্জর করিব লণ্ডভণ্ড।
বলি দিব কলিঙ্গ রায় তুষিব চণ্ডিকা মায়,
আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড॥

রূপরাম

বারমতি

ইহা শুনি লাউসেন কর্ণে দিল হাত।
রাম রাম স্মরণ করে জগন্নাথ ॥
কি করিব পান গুয়া শীতল চন্দন।
গৃহস্থের বাড়ী আমি যাই না কখন ॥
শিশুকাল হইতে আমি ধর্মের তপস্বী
শুক্রবার দিনে মোর ধর্ম-একাদশী ॥



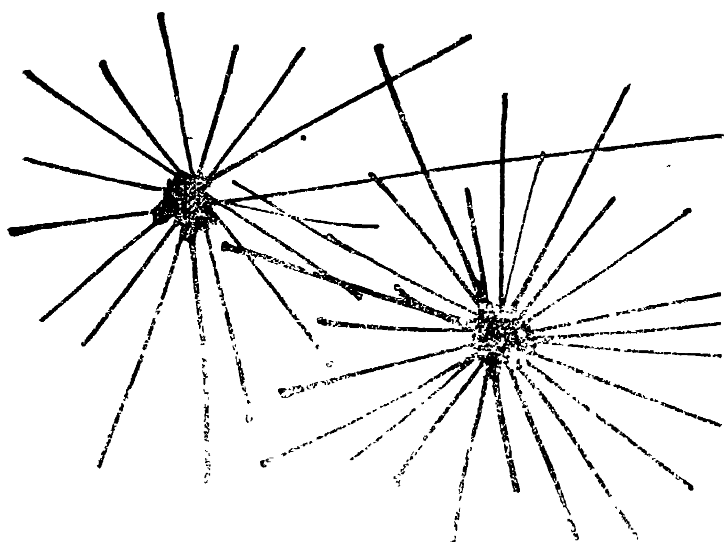
গোবিন্দ দাস

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লী মালতী যুথী
মত্ত মধুপ ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
ফুলবতী-চিত-চোরণি॥

লোচন দাস

আক্ষেপানুরাগ

জ্বালার উপর জ্বালা সই
    জ্বালার উপর জ্বালা।
জলকে যাই পথ না পাই
    বসন টানে কালা॥
সরম কর‍্যা ভরম কর‍্যা
    বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা
    ধরে আমার হাতে॥
রস করিতে জানে যদি
    তবে সে মনের সুখ।
গোপত কথা বেকত করে
    এই সে বড় দুখ॥
চলমল্যাকে চতুর বলি,
    হেটমুড়্যাকে জপু।
রস জানিলে রসিক বলি
    নৈলে বলি ভেপু॥
লোচন বলে আ লো দিদি
    ইহা বললি কেনে।
কালার সমান রসিক নাই
    এ তিন ভুবনে॥



মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

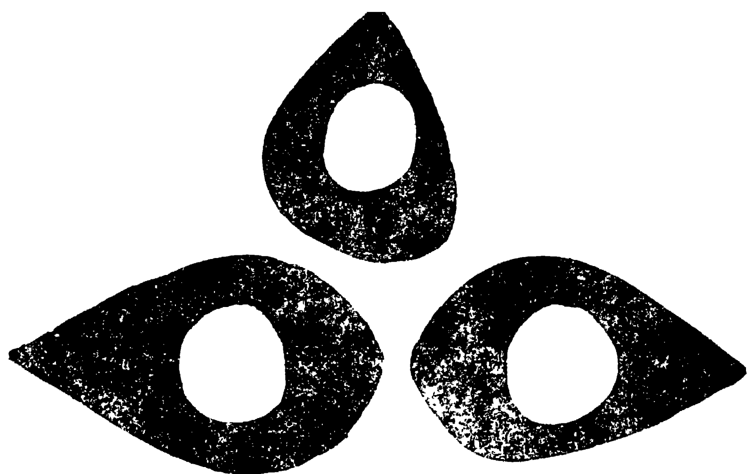
অভয়ামঙ্গল

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর‍্যাছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
একুনে হৈল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি॥
মাংসের নেছিলা বাকি ধারি দেড় বুড়ি।
কিছু লহ চালু ক্ষুদ্র কিছু লহ কড়ি॥

ভারতচন্দ্র রায়

অন্নদামঙ্গল

আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো স্থুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এস চলে॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাই যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়
নারদের মন্ত্রতন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল



রামপ্রসাদ সেন

ভূতলে থাকিয়া মা গো
করলে আমায় লোহাপেটা ;
তবু আমি কালী বলে ডাকি
সাবাস আমার বুকের পাটা।

মধুলাল

শিবনাথ কি মহেশ

ধন্য ধন্য রাজা ধন্য বংশের ছুলাল ।
ধন্য ধন্য পিতামাতা ধন্য পাল গোপাল ॥
শিবের বরেতে তব গায়ে হোক বল ।
গম্ভীরনাথের পূজা করহ উজ্জ্বল ॥
শিব শিব বলি লহ শিব আশীর্ব্বাদ ।
বঙ্গ সিংহাসনে যেন পুরে মন সাধ ॥
শিবভক্ত তুমি বট লহ শিবনাম ।
তোমার চরণে মধুলালের প্রণাম ॥

শ্যামলাল

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা

দোল পূর্ণিমা নিশি নির্ম্মল আকাশ।
ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস ॥
লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ।
করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন ॥
হেনকালে বীণা নিয়া আসি মুনিবর।
নারায়ণের সাক্ষাতে কহিলা বিস্তর ॥
তারপর করজোড়ে করিয়া প্রণতি।
কহিল নারদ মুনি নারায়ণী প্রতি ॥
কহ মাতঃ! এ কেমন তোমার বিচার।
চঞ্চলা চপলা প্রায় ফির দ্বারে দ্বার ॥



ঈশ্বর গুপ্ত

তুমি মা কল্পতরু
আমরা সব পোষা গরু
শিখি নি শিং বাঁকানো
　　কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা
তুলে মামলা
　　গামলা ভাঙে না।
আমরা ভুষি পেলেই খুশী হব
　　ঘুষি খেলে বাঁচব না।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

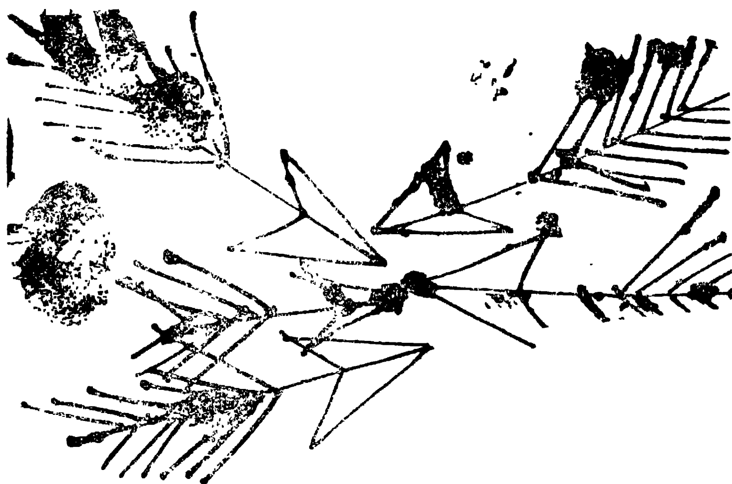
বঙ্গসুন্দরী

সর্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা।
উঃ কী অনন্ত জ্বালা,
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ যেমন !



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ও ভাই শ্যামচাঁদ !
কি দাদা !
ওরে সাপ রে !
বাপ রে !
ওরে ঘরের ভিতর সাপ !
কি দুর্দ্দৈব ! কি হতভাগ্য ! কি মনস্তাপ
এখন কি করি ?
আমি যে ভয়ে মরি।
ওরে কালাচাঁদকে ডাক্।
ও কালাচাঁদ ! ও গোরাচাঁদ।
ওরে সবাই ভিতর লুকিয়ে থাক।
কি হয়েছে ?
সাপ।
বাপ।
ঘরে।
এখন কে ধরে !



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বকুল বকুল বকুল,
বৃন্দাবন গোকুল,
একে চন্দ্র তিনে নেত্র,
কাশী আর কুরুক্ষেত্র,
চেরে আর তিনে সাত,
জগন্নাথ চন্দ্রনাথ,
তারা তিথি রাশি বার,
জ্বালামুখী হরিদ্বার,
এ সব তীর্থে নাহি বার,
কোথা তবে আছে আর,
যে লগ্নে প্রশ্ন করা,
চিরজীবী হয় মরা,
রন্ধ্রগত আছে শনি,
সরোজিনীর প্রমাদ গণি।



উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে,
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুল-কুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড় সুন্দর কথা, শুন মন দিয়া।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

তা বটেই তো তা বটেই তো

দেখ, হতে পার্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির ;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ   তেমন করি না পছন্দ ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ;
তাই বাক্যে বীরই হয়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই তো—
তা—নইলে খুব এক বড়ো—

হাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো।...

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

মামার বাড়ি

মামাদের দরজায়
বাঘা থাকে এক ;
তেড়ে নাহি আসে, নাহি
করে ভেক্ ভেক্ !

মামাদের পুকুরেতে
আছে বড় রুই ;
পশু আর মাছে মিলে
একে একে দুই।

মামাদের বাগানেতে
চরিছে হরিণ ;
দুই পশু, এক মাছ—
দু'য়ে একে তিন।

মামাদের রাঙা গরু
কিবা রূপ তার ;
তিন পশু, এক মাছ—
তিনে একে চার।

মামাদের বানরের
কি মজার নাচ ;
চারি পশু, এক মাছ
চারে একে পাঁচ।

মামাদের সাদা ভেড়া
উঠানেতে রয় ;
পাঁচ পশু, এক মাছ
পাঁচে একে ছয়।

মামাদের খরগোস
চাটে এসে হাত ;
ছয় পশু, এক মাছ—
ছয়ে একে সাত।

মামাদের পোষা মেনী
যেন বড় লাট।
সাত পশু, এক মাছ—
সাতে একে আট।

মামাদের রাজহাঁস
পুকুরেতে রয় ;
পশু, পাখি, মাছে মিলে
আটে একে নয়।

মামাদের চাকরের
হয়েছে বয়স,
সবে তারে ভালবাসে
নয়ে একে দশ।

আষাঢ়ে ছড়া

প্রমথ চৌধুরী

এ বুঝি আষাঢ় মাস,
তাই ছুটে চারিপাশ
শুধু করে হাঁসফাঁস
পুবের বাতাস।
কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেট ফুলো,
পুঁটলি পাকিয়ে গুলো
জুড়িয়া আকাশ।



করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আব্‌ছায়ায়

জলের পারে ঝাউয়ের সারি
জ্যো'স্নালোকে দেখায় কালো ;
অনেক দূরে পাহাড়-চূড়ে
রাতের কাজল হয় ঘোরালো।
আব্‌ছায়া সে বেড়ায় ঘুরে
ডাক্ দিয়ে যায় চেনা সুরে,
মুখের রেখা যায় না দেখা—
চলার সাথী বাতি জ্বালো।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

চাষার ঘরে

সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই—সত্যি কথাই বলি,
বড়োলোক যারা—খেতে বলে কেউ? মিছে এত বড় হ'লি
চা ও খানদুই বিস্‌কুট্ নামে সঙ্গে তাহারি চাট্—
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-কেউ ভদ্র আনার ঠাট্!
বাজে কথা যাক্;—ক'বিঘা চোতেলি করেছিস্ এই সন?
পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক' কাহন?
মহাজন-দেনা রাজার খাজনা—হয়েছে তো সব শোধ
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে, বিবেচনা-বোধ!
ওরে ও মদনা একটা কল্‌কে তামাক পারিস দিতে?
—দিয়েছিস্ নাকি! এ যে দেখি তুই বাপেরেও
গেলি জিতে!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শিল



ঠিক দুক্কুর বেলা ঘুর্‌ঘুট্টি !
থই থই মেঘ কালো কুরকুট্টি !



ইন্দ্রের কোচম্যান গলা খাকরায়,
ঐরাবতের পিঠে বেত হাঁকরায়।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

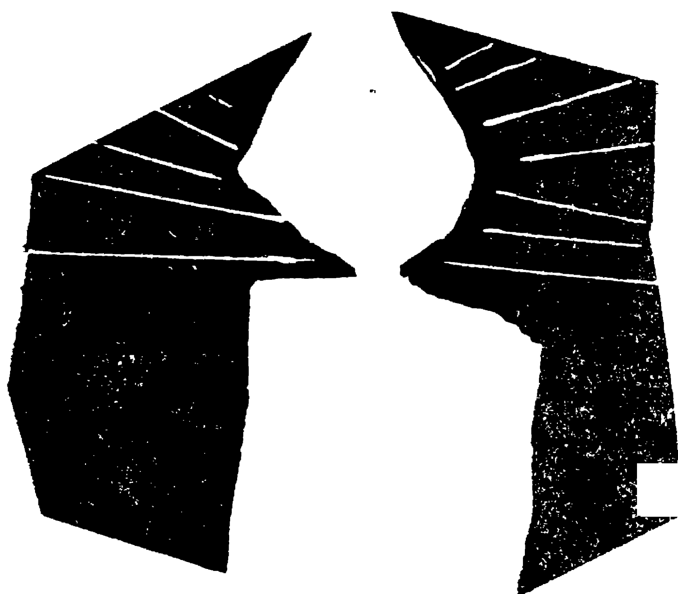
পাড়াগেঁয়ে

কাঠ-পাথরের শহরেতে হয় না আমার ঘুম,
রাত্রি ভরি হরঘড়ি সেই ঘর্ঘর গুম্‌গুম্‌।
স্বস্তি নাহি তিল,   গর্জিছে হুইশিল,
কড়া নাড়ার নাইতো বিরাম যাতায়াতের ধুম্‌।

আমি থাকি সুদূর গ্রামে বনরাজির মাঝ,
শোভন লোভন শ্যামল কোমল নিয়েই আমার কাজ
শর্বরী নিঃঝুম   ঝিঁঝিঁদের মরশুম্‌
চারি দিকে মধুর মৃদু মিষ্টি সব আওয়াজ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
বোশেখী ছড়া

গাঁর শেষে পথ শেষ, ভোলা মাঠ শুরু
কচি অশথের পাতা কাঁপে ঝুরু ঝুরু ॥
ঝুরু ঝুরু কাঁপে পাতা উড়ু উড়ু মন।
ঠিক দুপুরের কোলে দোলে শরবন ॥
শরবনে বীণ বাজে সরস্বতীর।
মাটির ঘোড়ায় মাঠে ছুটে চলে পীর ॥
ঝিনঝিন করে দিন প্রাণ আইঢাই।
ঢ্যালাবন খুঁজে দুটো তরমুজ খাই ॥
চোখ বুজে তরমুজে শুনি কিচকিচ।
কেটে দেখি গুচ্ছের উচ্ছের বীচ ॥



সুখলতা রাও
সপ্তাহ

এক ছিল সাতু রায়—
সোমবারে জন্মায়।
মঙ্গলে ভাত খায়
বুধবারে স্কুলে যায়।
বিষ্যুতে খুব বাড়ে
শুক্কুরে বিয়ে সারে।
শনিবারে হল বুড়ো,
রবিবারে থুত্থুড়ো।
সপ্তাহ গেল যেই,
আয়ু গেল ফুরিয়েই।

কালিদাস রায়

ভগবানের বিদায়

সাহিত্য হইতে প্রভু এবে স'রে পড়ো,
আশ্রম মন্দির মঠ এবে সার করো।
ছিলেন মহাত্মা গান্ধী বড় ভক্ত, হায়,
তাঁহার ভক্তেরা আর মানে না তোমায়।
গাহিয়া তোমার নাম অস্ত গেল রবি,
তোমায়ও বিদায় দিল আর সব কবি।
তরুণ কবিরা লেখে যত স্পষ্ট কথা
শুধুমাত্র বাদ দেয় তোমার বারতা।
কবিতা যুবার তরে, হইয়াছ বুড়া,
তোমারে ডাকিছে শোনো মঠের সাধুরা।
স'রে পড়ো, হ'লে নাকি জরায় বধির?
চ্যাঙ দোলা করে সবে করিবে বাহির।



কাজী নজরুল ইসলাম

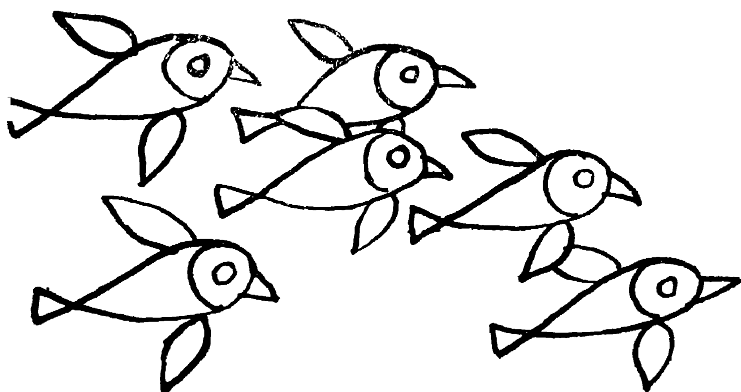
কানের তার দুল্
কোথায় তার তুল্
দুলের লাল্চায়
শরম পায় গাল

দোদুল্ দুল্ দুল্
কোথায় তার তুল্ ?
গালের লাল্ ছায়
নথর তুল্তুল্ ।

বনফুল

শকুনি

কৃষক বসিয়া চাহিছে আশায়
নদীতে কখন পড়িবে চড়া
ঘরে ও বাহিরে কুমারী ভাবিছে
শাঁস দেখে চাই প্রেমেতে পড়া।
বসে আছে যত লুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।
ভাবে ডাক্তার অসুখে কখন পড়িবে কেবা,
উকিল ভাবিছে করিব কখন আইন সেবা।
উদগ্রীব হয়ে রয়েছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।
ভুলাতে পাঠক, লেখক বসিয়া লিখিছে যা' তা',
ভিজাইতে হায় নয়ন পাতা, চাঁদার খাতা,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।
সমরাঙ্গনে বাজিছে অসির ঝনৎকার
শিল্পীর সেরা মূর্তি ফেলিয়া গড়িছে ঘড়া
সবারই গলায় ফাঁসির দড়া
অট্টহাসিয়া কহে মহাকাল
সবাই শকুনি সবাই মড়া।



জীবনানন্দ দাশ

মাঝে-মাঝে দু-চারটে প্লেন চ'লে যায়।
একভিড় হরিয়াল পাখি
উড়ে গেলে মনে হয়, দুই পায়ে হেঁটে
কত দূর যেতে পারে মানুষ একাকী।

অমিয় চক্রবর্তী

বিনিময়

তার বদলে পেলে—

সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল-বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—
ফুলে নোয়ানো ছায়া-ডালটা
বেগনি মেঘের গুড়া পালটা
ভরলো হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে ॥

তার বদলে পেলে—

শাদা ভাবনা কিছুই-না-এর
খোলা রাস্তা ধুলো-পায়ের
কান্না-হারা হাওয়া—
চেনাকণ্ঠে ডাকলো দূরে
সব-হারানো এই দুপুরে
ফিরে কেউ-না-চাওয়া।
এও কি রেখে গেলে ॥



জসীমউদ্দীন

আমার বাড়ি

আমার বাড়ী যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।
শালি ধানের চিঁড়ে দেব,
বিন্নি ধানের খই,
বাড়ীর গাছের কবরী কলা,
গামছা বাঁধা দই।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাতি।
চাঁদমুখে তোর চাঁদের চুমো
মাখিয়ে দেব মুখে,
তারা ফুলের মালা গাঁথি
জড়িয়ে দেব বুকে।
গাই দোহানের শব্দ শুনি
জেগো সকাল বেলা,
সারাটা দিন তোমায় লয়ে
করব আমি খেলা।

আমার বাড়ী ডালিম গাছে
ডালিম ফুলের হাসি
কাজলা দীঘির কাজল জলে
হাঁসগুলি যায় ভাসি।
আমার বাড়ী যাইও ভোমর,
এই বরাবর পথ
মৌরী ফুলের গন্ধ শুঁকে
থামিও তব রথ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্যাঁড়াতলা

ওরে ক্ষ্যাপা, ক্ষ্যাড়া, ভোলা,
চল্ যাই গ্যাঁড়াতলা।
ট্যারা চোখ, ঘাড় চাঁছা,
নেই কোঁচা, নেই কাছা।
শুধু কাঁচি ছুরি ছোরা
টাকা মারি কুড়ি তোড়া।
অলিগলি জিগ-জ্যাগ
তুলে নিই মনি ব্যাগ।
বাবু কত ঘুরিছেন,
তুলে নিই ঘড়ি-চেন।
কান ধরে মারি টান
দুল পাই চারিখান।
মারি টান চুড়ি-হার,
সাথে আছে জুড়িদার।
কিছু নাই ভয়-ডর
সবে জানে কয় ঘর।

দারোগা তো গাধা ঘোর
সকলেই গাঁজাখোর।
এ উহারে উস্কায়
যত দাও ঘুষ খায়।
একজোটে কয় শালা
করি ভাগ-ফয়সালা।
একি ভীম গদাঘাত,
এক কোপে কুপোকাৎ!
মুখে সব এক ডাক
সকলেরই ট্যাঁক ফাঁক।
কোন্ চোর ছিঁচ্‌কে
টান্ লিয়া খিঁচকে
যার যত রোজগার—
কে কোথায় খোঁজ কার!
চোর পর জুয়োচুরি
এ যে দেখি কুয়ো চুরি!

সেই থেকে নাকে খত,
পড়ি শুধু ভাগবত

বিষ্ণু দে

বুড়ো-ভোলানো ছড়া

আয় বৃষ্টি হেনে,
ছাগল দেব মেনে,
বোমা যাবে ডুবে
ডাকাতের দল উবে।

সুন্দরবনে ভীষণ-বাঘ
তাদের চোখে দেশের রাগ
নখে তাদের বেজায় ধার,
খাঁড়ার মতোই দাঁতের সার।

আয় বৃষ্টি হেনে,
ধান বিছালি মেনে
জবাব দেব বোমায়
ডাকাত যেথা ঘুমায়।

মরা গাঙেও যা কুমীর,
নৌকা হবে চৌচির,
গোখরো সাপের দেশ রে ভাই
মারবে শেষে ফণার ঘা-ই।

আয় বৃষ্টি হেনে
চরকা দেব মেনে,
বোমা যাবে ফেঁসে,
এদেশ সর্বনেশে।

সূর্যে আছে অগ্নিবাণ
হিমালয়ের কঠিন গান,
সাগর ঘেরা বালির বাঁধ
হাতের দড়ি চোখের চাঁদ।

আয় বৃষ্টি হেনে,
পরমায়ু দিই মেনে,
কামান দাগায় বাজে
চোরা পালায় লাজে।

উড়ো জাহাজের নোঙর তোল্,
ডাকাত ডিঙির ফাটক খোল্,
এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার
তিরিশ কোটির হাতিয়ার!

দুনিয়া দেখে অবাক আজ,
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ,
সঙ্গে আছে নানান দেশ,
ঘরের খেয়ে বনেই শেষ।

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো-আনা ভাত ঘরেই খা।
ছ'পণ ছ' কুড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ি।
বৃষ্টি আসে হেনে
সব দিয়েছি মেনে॥



অশোকবিজয় রাহা

মায়াতরু

এক যে ছিল গাছ
সন্ধে হলেই দু হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠত যখন
ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গর্‌গর্‌
বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠতো হেসে
কোথায় বা সে ভালুক গেল, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।

ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হত কী যে,
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হল যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি পড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।



সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জার্নাল

সব যায় ট্র্যাম-ট্রেন-প্লেন।
সব থাকে কাফে ও হোটেল।
কিছুই হল না লেনদেন
কতো বর্ষা বসে আছি নিয়ে যুঁই-বেল॥

তারাপদ লাহিড়ী
কাশীপুরের বাসি কথা

ঘরছাড়া সব বাঙ্গাল
ভাত কাপড়ের কাঙ্গাল
জুটলো এসে বঙ্গদেশে দণ্ডকবন ছেড়ে।
খবর শুনে টেকোমাথার গান্ধীটুপি নেড়ে
মহামাত্য বচন দিলেন, 'মোদ্দা কথা এই—
পিপীলিকার পাখ্‌না ওঠে মরবার জন্যেই।
পাথরভরা ভুঁই দিয়েছি চষতে—
টিন দিয়েছি ছাপড়া বেঁধে বসতে,
হাল কিনতে তঙ্কা দিলাম, আরও দিলাম মোষ—
হাভাতে সব বাঙ্গালগুলো তাও মানে না পোষ!
সাফ কথাটাই বলছি তবে,
জলদি ফিরে আসতে হবে;
দান খয়রাত্‌ দু'চার ফোঁটা না হয় দেবো আরও।
নইলে কানে দিলাম তুলো—ফোঁপাও যত পারো!'

'ঠাঁই হবে না, ঠাঁই হবে না, যেতেই হবে ফিরে'—
ছুট্‌লো হুকুম গঙ্গা-অজয়-ইছামতীর তীরে।
কুলিশপাণি পুলিশ এলো—এলো মোটর ট্রাক্‌
গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌ শব্দে হঠাৎ কানের পাটা ফাঁক।
'কি হয়েছে?'—'কিছু না তো—
ন্যাংটো মানুষ গোটাকতো
অকালমরণ প্রাপ্ত হলো—এমনিতরো রোজ
মরছে কতো পোকামাকড়, কে রাখে তার খোঁজ?
স্বাধীনতার পুণ্যাহ যে—শুনছো না তার বাদ্য?
নরমুণ্ড দু'চার গোটা বার্ষিকী বরাদ্দ।'

নরেশ গুহ

রুমির ইচ্ছা

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাস।

তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব রোজ
পায় না আমার কেউ খোঁজ।
তবে আমি উড়ে উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ।

হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল লাল
ভরে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।



আলোক সরকার

ম্যাজিক

হঠাৎ হলো বেড়ালছানা—ম্যাজিক !
আস্তে আস্তে বেড়ালছানা
গুটিয়ে নিল হাত দু-খানা—
কুঁজো শেয়াল ? বুড়ো ভুতুম ?—রাবিশ
ওই দেখো না শূন্যে পা
চোখ ক-খানা গুনবে না
পায়ের উপর ঝুলছে নাক কিম্ভূত।
ভয় দেখাবে ? বাড়াবে হাত ?
ওরেব্‌বাস ! কী সংবাদ
ঐরাবত ? উইয়ের ঢিপি—দ্যুৎ !
বই বগলে ফ্যাকাশে মুখ
দাঁত কনকন ? পেটের অসুখ ?
গাছের নীচে একটুখানি একলা।
হাওয়া দিয়েছে ভাদ্রমাস
রোদ নাচছে দামাল কাশ—
হঠাৎ এ কী ! সারা আকাশ মেঘলা।

পুরোভূমি : পূর্ণাঙ্গ ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অগ্নিকাণ্ড

'তোলপাড়িয়ে উঠল পাড়া
তবু কর্তা দেন না সাড়া।
জাগুন শিগ্‌গির জাগুন!'

'এলারামের ঘড়িটা যে
চুপ রয়েছে, কৈ সে বাজে?'

'ঘড়ি পরে বাজবে, এখন
ঘরে লাগল আগুন।'

'অসময়ে জাগলে পরে
ভীষণ আমার মাথা ধরে।'

'জান্‌লাটা ঐ উঠল জ্ব'লে—
উর্ধ্বশ্বাসে ভাগুন।'

'বড্ড জ্বালায় তিনকড়িটা।'

'জ্বলে যে ছাই হ'ল ভিটা—
ফুট্‌পাথে ঐ বাকি ঘুমটা
শেষ করতে লাগুন।'



বর এসেছে বীরের ছাঁদে

বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
শ্যালির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,

বিয়ের লগ্ন আটটা—
গালেতে গালপাট্টা।
আলাপ যখন উঠল জমে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
বর হেসে কয়—'ঠাট্টা!'

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রকাশিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক

"মাকড় আবার জাল পেতেছে।"
"আর ভয় নেই—রোদ এসেছে।"
"মৌচাক ছেড়ে মাছিরা ছোটে।"
"বাদলের ভয় নাইকো মোটে।"
"বনে বনে ওঠে পাখির সুর।"
"উড়ে চল, পার যতদূর।"
"আকাশ জুড়িল রামধনুকে!"
"চল—গেয়ে চল মনেরি সুখে।"



দুই

মেঘ লেগেছে কালা-ধলা
বইছে বাতাস জলা-জলা
বরফ গলা পাগলা-ঝোড়া
শুকনা ধুয়ে আসে
তিস্তা নদীর পাশে—
ঝাপুর-ঝুপুর ছাপুর-ছুপুর
ছাপুর-ছুপুর ঝাপুর-ঝুপুর।



সুকুমার রায়

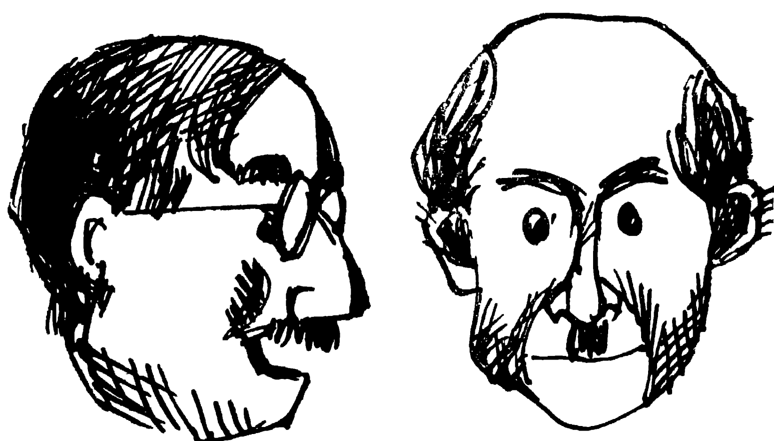
প্যাঁচা আর প্যাঁচানী

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী,
    খাসা তোর চ্যাঁচানি
শুনে শুনে আন্‌মন
    নাচে মোর প্রাণমন!
মাজা-গলা চাঁচা সুর
    আহ্লাদে ভরপুর!
গলা-চেরা ধমকে
    গাছ পালা চমকে,

সুরে সুরে কত প্যাঁচ
    গিট্‌কিরি ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্!
যত ভয় যত দুখ
    দুরু দুরু ধুক্ ধুক্,
তোর গানে পেঁচি রে
    সব ভুলে গেছি রে,
চাঁদামুখে মিঠে গান
    শুনে ঝরে দু' নয়ান।

ফস্‌কে গেল !

দেখ্‌ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি দেখ্‌রে খেলা দেখ্‌ চালাকি,
ভোজের বাজি ভেল্কি ফাঁকি পড়্‌ পড়্‌ পড়্‌ পড়্‌বি পাখী—ধপ্‌
লাফ দি' রে তাই তালটি ঠুকে তাক ক'রে যাই তীর ধনুকে,
ছাড়ব সটান ঊর্ধ্বমুখে হুশ্‌ ক'রে তোর লাগ্‌বে বুকে—খপ্‌
গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়্‌ গুড়িয়ে হামা খাপ্‌ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা,
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা, এই বারে বাণ চড়িয়ে নামা—চট্‌ !
ঐ যা ! গেল ফস্কে যে সে—হেঁই মামা তুই ক্ষেপ্‌লি শেষে ?
ঘ্যাঁচ ক'রে তোর পাঁজর ঘেঁষে লাগ্‌ল কি বাণ ছট্‌কে এসে—ফট্‌ ?



সুনির্মল বসু

এক

আতাই পাতাই
দুইটি বুড়ো,
দেখতে পেল
পাহাড়-চুড়ো।
তর্‌তরিয়ে
উঠতে গিয়ে
পিছলে পড়ে
হাড্ডি গুঁড়ো।

দুই

সোনার গাছে হীরের ঝাড়
খোকার হাতে ক্ষীরের ভাঁড়
ক্ষীরের ভিতর মশার ডিম,
আবছা ভোরে ঝাপ্সা হিম্।
ছাতিম তলায় হাতীর নাচ,
পিছল পথে হিজল্ গাছ।
বক্সী পাড়ার খ্যাঁকশিয়াল—
আঁকশি নিয়ে যাচ্ছে কাল্।
মুণ্ডু সবার ঘুরায় রে—
আমার ছড়া ফুরায় রে।



প্রেমেন্দ্র মিত্র

আগুন

আগুন ! আগুন !
কোথায় আগুন ?
উনুনে, না লণ্ঠনে ?
নিভুনিভু ? গনগনে ?
খোড়ো চালে ? কামারশালে ?
না কি পুবে রাত পোহালে
সুয্যি মামার লাল মুখে ?
কোথায় আগুন ? কার বুকে ?

সামলে রাখো যেখানে থাক্,
দাউ দাউ সব না-করে খাক্,
না যেন বা নেভে।
শত্তুর নয়, করলে স্যাঙাত
আগুন-ই সব দেবে !

মামলা

ওপারে তিনটে দাঁড়কাক আর
এপারে সাতটা শালিখ
মামলা লড়ছে,—মাঝের নদীর
কারা হক্কের মালিক।
বায়সেরা বলে, "শোন মুখখুরা,
কী বলে জলীয় আইনে,—
নদীটা তাদের,
যারা থাকে তার ডাইনে।"
শালিখেরা বলে, "চুপ!
আইন বুঝিস খুব!
জোয়ার না কি সে ভাঁটার হিসেবে
খবরটা আগে তাই নে!"
ছুদলে চেঁচায়, হেনকালে এক
পানকৌটির ছা,
মকদ্দমার ধারও ধারল না।
নদীর গভীরে
আচমকা দিয়ে ডুব,
মাছ নিয়ে যায়। জুলজুল চায়
ছুপারে যত বেকুব।

অন্নদাশঙ্কর রায়
হাভাতে

শুদ্ধোধন দাশগুপ্ত
শুদ্ধোধন দাশগুপ্
ঘরের কোনে বসে আছ
কেন অমন চাপচুপ।
হায়রে আমার পোড়া কপাল
হায়রে আমার পোড়া কপ্।
হোটেল থেকে দিয়ে গেল
গণ্ডা কয়েক মাটন চপ।
বেড়াল এসে খেয়ে গেল
খপা খপ গপা গপ।
হায়রে আমার পোড়া কপাল
হায়রে আমার পোড়া কপ্।



লেবু

লেবুর পাতা করমচা
দাও আমাকে গরম চা।
লেবু-ওটা সরবতি
দাও তা হলে সরবৎ-ই।
লেবু ওটা পচ ধরা।
আমার সঙ্গে মশকরা!
বানাও তবে চাটনি
জিহ্বা দিয়ে চাট নিই।

অজিত দত্ত

মনের ছড়া

তোমাদের কাছে চুপি-চুপি বলি ভাই
মনে-মনে ছড়া লিখে ভারী মজা পাই।
কত কী যে উদ্ভট, কত আজগুবি,
সে-সবের ছড়া লিখে মজা পাই খুবই।
সব টেনে আনি, এই মনের ছড়াতে,
যা-খুশি, মেলাই এনে যা-খুশির সাথে।
কেউ নেই দোষ ধরে, বলে কিছু মন্দ
মনের ছড়ায় নেই কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
যা-কিছু মিষ্টি, যাতে মজা পাওয়া যায়
সবই আসে ভিড় করে মনের ছড়ায়।
রেলগাড়ি হয়ে যেন মন ছুটে চলে,
দেশ-বিদেশের যত স্থলে আর জলে।
কখনো বা পাখি হয়ে মেলে দেয় ডানা,
কোন্ আকাশের নীচে কে জানে ঠিকানা।
আবার কখনো ছেলেমেয়েদের সাথে,
নতুন-নতুন কত ফুর্তিতে মাতে।
কখনো সে খেলোয়াড়, কখনো পেটুক,
সব কিছু কুড়িয়েই এ-ছড়ার সুখ।
তোমাদেরও মনে-মনে ছড়া যদি আসে,
পালাতে দিয়ো না, লিখো এক নিশ্বাসে।



ছড়া কাটার ছড়া

ঘুড়ি-কাটাকাটি এক মজাদার খেলা
কথা-কাটাকাটি হলে বড়ই ঝামেলা।
কাটাকুটি খেলো যদি জিরো আর ক্রসে
সময়টা কেটে যাবে বেশ ঘরে বসে।
বর্ষাটা কেটে গিয়ে পুজো এলে বাঁচি,
ছুটিটা কাটাতে যাব চুনার কি রাঁচি।
ক্লাস কেটে দিন যদি ঘুমিয়ে কাটাবে
ফেল হলে একেবারে মাথা কাটা যাবে।
হাতকাটা জামা গায়ে বাঁকা টেরি কেটে
আমাদের পাশ কেটে কে চলেছে হেঁটে ?
লোকটি সাঁতার কাটে রোজ কাটা খালে
আশা রাখে নামজাদা হবে কোনো কালে।
বলটা কাটিয়ে নিয়ে পাকা খেলোয়াড়
গোল দিয়ে এল ছ্যাখো কী চমৎকার।
কত যে নকশা কাটা জামা আর শাড়ি,
জল কেটে জাহাজেরা দূরে দেয় পাড়ি।
এতখন ছড়া কেটে হয়ে গেছি কাবু
এইবারে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো বাপু॥

বুদ্ধদেব বসু

মাঠ পেরিয়ে বাড়ি,
সামনে ছোটো উঠোন,
পাছ-দুয়োরে পুকুর।
তার পরে ফের মাঠ,
মাঠের শেষে আকাশ,
মস্ত বড়ো দূর।



ইচ্ছে করে, মাগো, আবার ছেলেমানুষ হই,
ঘরের কোণে চুপটি করে একলা বসে রই।
ডাকবে না কেউ ক্ষণে ক্ষণে—আছেন অমুক বাবু?
গায়ে পড়ে তর্ক করে করবে না কেউ কাবু।
চাইবে না কেউ টানতে দলে, ডাকবে না কেউ সভায়
দয়া করে আসবেন না হিতৈষীরা সবাই
ঠিক কথাটা বুঝিয়ে দিতে, কিংবা নিতে সই।
ইচ্ছে করে মাগো, আবার ছেলেমানুষ হই।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

টুপ্ টাপ্ বড়ো বড়ো, ফোঁটা পড়ে বৃষ্টির
এখনি যে ডুবে যাবে গাছপালা সৃষ্টির।
ঝাপসা সে দূর গ্রাম
নদীপাড় থই থই
আমরাও ভিজে চলি নেচে করি হৈ হৈ॥
গায় গান কোলা ব্যাঙ
মাঝিরাও সারি গায়
সারি সারি দাঁড় বেয়ে
ভরা গাঙ পাড়ি দেয়।
চুপ্‌চাপ্ ভিজে বক
পথঘাট নিঃঝুম।
বৃষ্টির একতারা
বেজে চলে ঝুমঝুম॥

ঘাসের ফুল

আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল
হাওয়াতে দোলাই মাথা।
তুলো না মোদের দলো না পায়ে
ছিঁড়ো না নরম পাতা।

শুধু দেখো আর খুশী হও মনে
সূর্যের সাথে হাসির কিরণে
কেমন আমরা হেসে উঠি আর
দুলে দুলে নাড়ি মাথা॥

ধরার বুকের স্নেহকণাগুলি
ঘাম হয়ে ফুটে ওঠে
মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূপকথা-নীল আকাশের বাঁশি
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে॥



সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সামনেওয়ালা ভাগো

বুকে বাঁধছে ঢাল যতই ছেড়ে যাচ্ছে নাড়ী
ভয় পেয়ে দেখাচ্ছে ভয়
পথে বসছে ফাঁড়ি

ইস্টনাম জপতে জপতে
হাতে ধরল খিল
হাতের ঠোঙা হাতেই রইল
মিঠাই নিল চিল

ঘোড়া টিপেছে গুলি ফুটেছে হাত ছুটেছে
মাভৈ
টিপসইয়ের যা নমুনা রে ভাই
তাতে তো ভয় পাবই
ভয় পেয়েছি বিষম ভয় পেয়েছি ভয় ভীষণ
আত্মারাম ছাড়তে চাইছে
খাঁচার ইস্—
টিশন
লাঠির আগায় ফুটো হাড়ি কাকতাড়ুয়া
মা গো
বাজল ঘণ্টা নড়ল নিশান চলল গাড়ি
সামনেওয়ালা ভাগো ॥



ছিমন্তর

লাগ লাগ লাগ ভেলকি।
চাল-চিনি মাছ তেল ঘি ॥
ইক্ড়ি মিক্ড়ি খিড়কির দোরে।
চোর নিয়ে যায় পুলিশ ধরে ॥
ওঁ হ্রীং স্বাহা ওয়াগন ফট।
যে বেটা নজর দিবি সে বেটা হট্ ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অকালবর্ষণ

টুপ টুপানি টুপ
কার কপালে টিপ ?
চুপ কর তুই, চুপ······
বুক করে ঢিপ ঢিপ ।

ঝরঝরানি অঝোরে
কেন রে তুই কাঁদো রে ?
কে গিয়েছে রাগ ক'রে ?

ঝিরঝিরানি ঝরছেই, ঝরছেই
শিউলিগুলি কেমন যেন করছে !
বৃষ্টিভেজা আগুন রে,
হেমন্তে কোন ফাগুন রে ?



স্থির চিত্র

গোধূলি যেন নীললোহিত,
জটায় কাঁপে মাঘের শীত।
রাত্রি যেন তার শিবানী,
তুষারে গায় ঘুমপাড়ানী।

সত্যজিৎ রায়

লিয়রের ছড়া / ১

চোরের ভয়ে রামনারায়ণ খোট্টা
ঘুমোয় ব'সে বন্ধ ক'রে দোরটা
এই সুযোগে দুই ইঁদুরে
দিব্যি খেলো পেটটি পুরে
ঝোলানো তার সাধের হ্যাট আর কোটটা।



লিয়রের ছড়া / ২

ওই দিকে দেখ দেখি তাকিয়ে
বিদঘুটে রাক্ষস নাকি এ ?
আরে না না এযে হরু
হয়েছে সে এত সরু
মামা তার রাখে তারে পাকিয়ে।



কানাইলাল চক্রবর্তী

এক

আকসি ধানের চিড়া কোটে
বকসি বাড়ির ঝি
কাল ঝিএর মেয়ের বিয়ে
তাকে দেব কী ?
তাকে দেব রেশমী চুড়ি
রাঙ্গা জামা গায়
রূপোর খাড়ু গড়িয়ে দেব
আলতা পরা পায়
কাল কন্যার বিয়ে হবে
চারদিকে শোরগোল
আজ খাচ্ছে দুধ ভাত
কাল মাগুরের ঝোল।

দুই

নদীর জলে নৌকা
হাওয়ায় ছোটে পাল
তার উপরে মেঘ দুলছে
তার উপরে লাল
লাল টুকটুক নীল টুকটুক
মেঘে ধরেছে রং
পাড়ার ছেলে কাঁসর বাজায়
ঢঙা ঢঙা ঢং।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আঁকতে পারি

আঁকতে পারি গেলাস, বাটি,
আঁকতে পারি থালা,
আঁকতে পারি অচিনপুরের
রাজকন্যের মালা।

কিন্তু তোমার ঘটে তো নেই
বুদ্ধি এতটুক,
তাই আমাকে আঁকতে বললে
রাজকন্যের মুখ।

আঁকতে পারি চক্ষু তাঁহার,
আঁকতে পারি নাক,
নকল চুলে লুকিয়ে রাখা
মস্ত বড় টাক,
ঠোঁটের পাশে কাজল দিয়ে
বানিয়ে-তোলা তিল,
কিন্তু সবটা মিলিয়ে মুখ
আঁকাই তো মুশকিল।



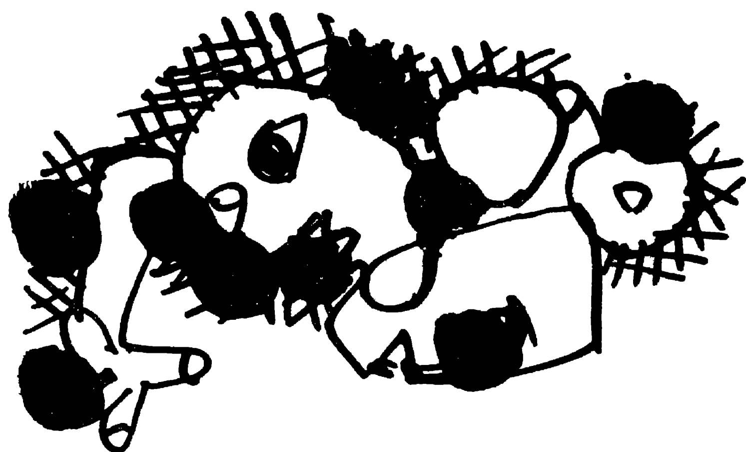
শানুর কাণ্ড

শানু বলল, "নিন্দে বটে
করছে দেশের লোকরা!
তাদের তো নেই বুদ্ধি ঘটে
আসলে কাঠঠোকরা
খুব সুদৃশ্য পক্ষী। জগাই
পট্‌লা এবং কেষ্ট
যার যা খুশি বলুক গে ছাই,
কাঠঠোকরাই শ্রেষ্ঠ।"

আমি বললুম, "ওহে ছোকরা,
এখন সন্ধ্যাকালে
দেখতে পেলে কাঠঠোকরা
কোন্ সে গাছের ডালে?"

শানু বলল, "সে ওই কালো-
জামের বৃক্ষে রয়।"
বলেই সে যে গাছ দেখাল,
অশথ তারে কয়।

উঠল শানু অশথগাছে
সঙ্গে নিয়ে খাঁচা।
নামতে দেখি, বসে আছে
ক্রুদ্ধ হাঁড়িচাচা
খাঁচার মধ্যে, চিৎকারে তার
কানের পর্দা ফাটে।
এখন ভয়ে-ভয়ে আমার
সমস্ত দিন কাটে।



সুকান্ত ভট্টাচার্য

সুতরাং

এত দিন ছিল বাঁধা সড়ক,
আজ চোখে দেখি শুধু নরক!
এত আঘাত কি সইবে,
যদি না বাঁচি দৈবে?
চারি পাশে লেগে গেছে মড়ক

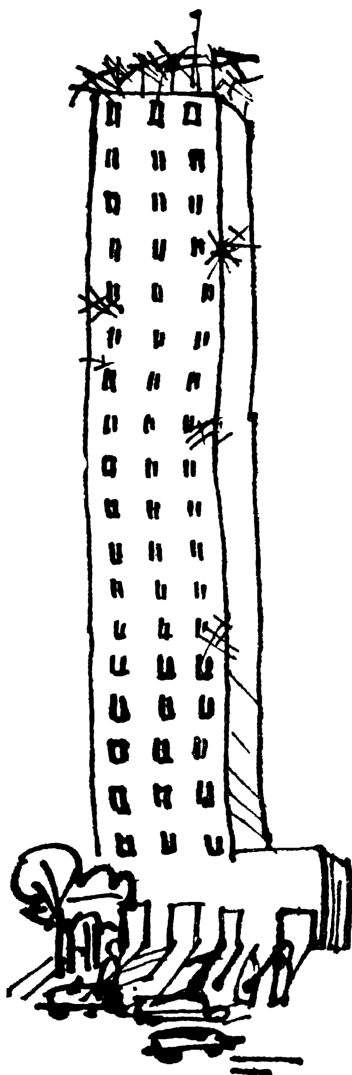
বহুদিনকার উপার্জন,
আজ দিতে হবে বিসর্জন!
নিষ্ফল যদি পন্থা;
সুতরাং ছেঁড়া কন্থা
মনে হয় শ্রেয় বর্জন॥

দেয়ালিকা

সকালে বিকালে মনের খেয়ালে
ইঁদারায়
দাঁড়িয়ে থাকলে অর্থটা তার
কি দাঁড়ায় ?

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

একটি লম্বা ছড়া



শুনুন মশাই
কোথায় বসাই
জায়গা যে নেই শহরে
ক্রমে ক্রমে
যাচ্ছে কমে
শহরটা যে বহরে।

বাদুড়-ঝোলা ঝুলছে
বাসের মধ্যে দুলছে
সোম থেকে সেই শনিবার
মশাই শুনুন
সংখ্যা গুনুন
আবালবৃদ্ধবনিতার।

দাঁড়ান লাইনে
বামে বা ডাইনে
পথ আছে, নেই শেষ

আপনি যা চান
কখনও তা পান ?
কেন ভুলে যান—
কী বিচিত্র এই দেশ !

ছড়া

দেনা যার বাড়ে প্রতিমাসে,
সেই মহামানব আসে,
পাঁচটার পর ট্রামে বাসে।

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক

গাঁয়ের নাম ভুলেশ্বর
এরই পাশে ফুলেশ্বর,
ফুলেশ্বরের ফুলমনি
তার কথাটা তুলবো নি···

ফুলমনি গো ফুলমনি
তোর কথাটা ভুলবো নি,
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না
এ-পোড়ামুখ খুলবো নি ॥



রং চড়ালাম একশ’ গুণ
দাম চড়ালাম হাজার,
পরচুলাটা খসে গিয়েই
মাটি ক’রলো বাজার!

অমিতাভ চৌধুরী

এক

ঢ্যাম্ কুড়্ কুড়্ ধা কুরিয়া
বাস চলেছে ঢাকুরিয়া
বাসের ভিতর বসে আছেন
ডালহৌসির চাকুরিয়া।



দুই

ছোট লোক বা বড় লোক
সবাই যাবে পরলোক।
ছোটই থাকো সুতরাং—
যেমন থাকে পিঁপিড়াং।



শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ছড়া

পানের বাপ ঠাকুরমার
বাবার তো নয়, কাকুর মা !
বাবার মা তো আমার দিদিই
—কপালে লিখেছেন বিধি !

আমরা থাকি একা-একা
ঠাকুরমায়ের পাই না দেখা
বাপুন তাঁকে করল চুরি
আমরা—একা-একাই ঘুরি
থাকুক দূরে ঠাকুরমা
বাবার তো নয়, কাকুর মা।

আতাচোরা

আতাচোরা পাখি রে
কোন্ তুলিতে আঁকি রে
—হলুদ ?
বাঁশবাগানে যাইনে
ফুল তুলিতে পাইনে
—কলুদ
হলুদ বনের কলুদ ফুল
বটের শিরা জবার মূল
পাইতে
তুধের পাহাড় কুলের বন
পেরিয়ে গিরি গোবর্ধন
নাইতে
ঝুম্‌রি তিলাইয়ার কাছে
যেই নদীটি থমকে আছে
তাইতে
আতাচোরা পাখি রে
কোন্ তুলিতে আঁকি রে
—হলুদ ?



বাংলার ছড়া

এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর
তার উপরে বসে আছে সিপাহী বিস্তর।
এক সিপাহী ফড়িংগুঁপো এক সিপাহী আধলা চাঁদ
আয়রে আমার সোনামণি, আয় দেখবি বালির বাঁধ।
বালির বাঁধে ডুমুরের ফুল, বালির বাঁধে ঘোড়ার ডিম
মাসী গো মাসী পাচ্ছে হাসি নিম গাছেতে হচ্ছে সিম।
মাসীর বাড়ি নারায়ণগঞ্জ, ফুফার বাড়ি আমেদপুর
এ পারেতে দুধ উথলোয়, ও পারেতে খেজুর গুড়।
পায়ে ফুটলো খেজুর কাঁটা, মাথায় তাগা বাঁধবে কে
রোদের মধ্যে বৃষ্টি নামলো, শ্যাল কুকুরের হচ্ছে বে!
এ পারেতে বৃষ্টি পড়ে ফুটো ঘরের চালা
ও পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা!
মানিক গেছে কুষ্টিয়ায় রাক্ষসেরা পান খায়
পান সাজতে হলো বেলা খান সাহেবরা বাড়ি পালা
ঝড়ে ডুবলো গয়নার নাও, তাঁবু ঠেকলো গাছে
তাই দেখে টাকডুমাডুম বিলিতি ভোঁদড় নাচে!
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, তুর্কি নাচন দেখে যা!

ও পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে!
ফুসমন্তর ফুসমন্তর দেখো তুমি কার?
চোখ খুললে যায় না দেখা, মুদলে পরিষ্কার!

খেলার নাম ধুন্ধুমার
নিয়ম এই রকম
বাইশ জোয়ানে বল ছোটাবে
যতক্ষণ না দম
ফুরোয় এবং দর্শক হয়
দশটি হাজার যম।

দম ফুরোলেই অন্য খেলা
সোডার বোতল ইঁটের ঢেলা
গোলের কাছে গণ্ডগোলে
হর হর বম্ বম্ !
খেলা ফুরুলে বাড়ি ফিরবে
দু' তিনজন কম।



আল মাহমুদ

তিন পাঁপড়ির ফুল

লিয়ানা গো লিয়ানা
সোনার মেয়ে তুই,
কোন পাহাড়ে তুলতে গেলি
গন্ধভরা যুঁই ?
বনবাদাড়ে যাই নি মাগো
ফুলের বনেও না,
রাঙা খাদির অভাবে মা
পাতায় ঢাকি গা।
চিবিদ গাছের ছায়ার পিনন্
অঙ্গে জড়িয়ে,
পাঁচ পাহাড়ের খাঁদের নীচে
যাচ্ছি গড়িয়ে।

নোলক

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেলো শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে ?
হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।

জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের হরিৎ টিয়ে করে রে ঝিকমিক
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরে ফিরতে চাই।

কোথায় পাবো তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখ-পাখালি বনের সাধারণ।
সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি না তো !
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো—
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।

এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরে ফিরবো না।



শঙ্খ ঘোষ

ছড়া

গন্ধমাদন পর্বতে
ফলত না কি বরবটি ?

এই না ভেবে জাম্ববান্
কিষ্কিন্ধ্যায় গম বানান।

সীতাও ছিলেন দুঃখিনী
কেননা কী কুক্ষণে

সমস্ত বরবাদ হল
হিঞ্চে খাবার সাধ হল।

লঙ্কাতে কি হিঞ্চে নেই ?
ওসব গুজব শুনছি নে—

বলতে বলতে লঙ্কারাজ
দেখতে গেল কুচকাওয়াজ।

খেপলে কিন্তু সত্যি সে
মারবে ছুঁড়ে শক্তিশেল

ফুটিয়ে দেবে জোরসে হুল
দেখবি চোখে সর্ষেফুল

সর্ষে হলে ধানগাছে
করবে না আর দাঙ্গা সে।

খান না চিনি-গুড় সীতা
শাকের শোকে মূর্ছিতা !

কাজেই তখন সবাই ধায়
চাষ করতে অযোধ্যায় !

দিন ফুরোল

সূয্যি না কি সত্যি নিজের ইচ্ছেয়
ডুব দিয়েছে ? সন্ধে হল ? তুচ্ছাই !

আকাশ জুড়ে এক্ষুণি এক ঈশ্বর
চম্‌কে দেবেন লক্ষ রঙের দৃশ্যে ।

লক্ষ, বা তা হতেও পারে একশো
কেই-বা খুলে দেখছে রঙের বাক্স !

আমরা কি আর দেখতে পাব ভাবছ ?
বাপমায়েরা যাবেই তবে মুচ্ছো ?

পাখির সারি যেমন ধানের গুচ্ছে
আঁধার ফেলে ঘরের দিকে উড়ছে

তেমনি এবার ফিরতে হবে সত্যি
নিজের নিজের মন-খারাপের গর্তে ।

বলবে বাবা, এইটুকু সব বাচ্চা
দিন ফুরোলেও মাঠ ছাড়ে না ? আচ্ছা !

মা বলবে, ঠ্যাংতুটো কী কুচ্ছিৎ !
একগঙ্গা জল দিয়ে তাই ধুচ্ছি ।



অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

শিমলা

পাহাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে অথৈ ওঠা-নামা,
শীতের নিথর শীতলপাটি, হরেকরকম জামা
গায়ের ওপর চড়িয়ে দিয়ে চলতে-চলতে শেষে
দাঁড়ালে ঠিক দেখতে পাবে পর্বতপ্রদেশে
রাত নেমেছে, খাড়াই ছেয়ে ঝরছে দীপাবলি
"অত নীচেও মানুষ থাকে ?" চাপা গলায় বলিঃ
"অত নীচেও থেকে মানুষ দিগ্বিদিকে আভা
কেমন করে জ্বালিয়ে ধরে ? কেমন কাঁপা-কাঁপা
সুখের শিহর ওদের ঘরের দেয়ালে ঢেউ তুলে
সন্ধ্যারতি সাজিয়ে দেয় মায়ের চরণমূলে ॥"

রাজকন্যে

বনের মধ্যে ঘর,
ঘরের মধ্যে কে ?
সুন্দরী এক রাজকন্যে এলেন কোত্থেকে !

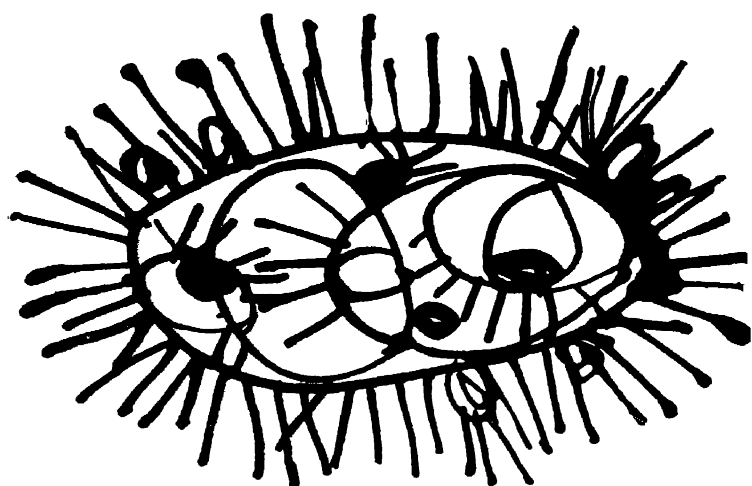
কী হলো তারপর ?
হঠাৎ প্রত্যেকে
ছুটে এসে বলল তাঁকে : 'দাও আমাদের বর'—

তিনি বললেন ; 'আয়
দুঃখীদের পাড়ায়
রাজার প্রাসাদ নিয়ে যাবো ময়ূরপঙ্খী নায়ে !'

পূর্ণেন্দু পত্রী

আবহমান ভগ্নী-ভ্রাতা

ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকে দুই বাংলা আমার
আপন স্বজন দুজন মাতা।
ভালবাসার সাঁকোর ওপর পা টলমল পা টলমল
পা বাড়ালেই পদ্মা নদী
হাত বাড়ালেই পদ্ম পাতা
এবার পাবো।
আজান-বাজান-ভাটিয়ালীর কণ্ঠনালীর ছন্দগাথা
প্রবহমান নদীনালায় শুনতে যাবো।
পাঁজর পোড়া গর্ত খোঁড়া হাটের মাঠের ঘরের ঘাটের
সব দরজা জানলা খুলে খুঁজতে যাবো
অগ্নিবরণ ভোরবেলাতে আমরা ক'জন আবহমান
ভগ্নীভ্রাতা।
ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকে দুই বাংলা আমার
আপন স্বজন দুজন মাতা।



কে থামাবি ?

মেসিনগান তো একটা যন্তর
তাকে দিয়ে জ্যান্ত প্রাণের বাঁচার মন্তর
কে থামাবি থামা।
পতাকায় জ্বলছে দাউ দাউ সূয্যিমামা।

সামসুল হক

ছড়া

ঘরের কোণে টিম্‌টিম্‌টিম্‌
জ্বলছে মোমের বাতি
টিক্‌টিকিটার পড়ছে ছায়া
মস্ত যেন হাতি
মোম হয়েছে নিবু-নিবু
টিক্‌টিকিটার ছায়া
দেখতে হলো ঠিক যেন এক
মস্ত খাটের পায়া।



যখন আমের আচার
করছিলি তুই পাচার
তখন কি তোর সময় হলো
হ্যাঁচ্চো করে হাঁচার ?

সুনীল জানা

বহুরূপী

মায়ের কোলে খোকা
দেখতে অতি বোকা।
বাবার কোলে গেলে
নাড়ুগোপাল ছেলে।
দাদুর কোলে যেন
জড়ভরত হেন।
ভাতের থালা কোলে
গোবরগণেশ দোলে।
ঘুমটি এলো যখন
ভিজে বেড়াল খোকন।
ঘুম ভাঙলো যেই
এমন বীর আর নেই।



পড়ুয়া

ফুল ফুটেছে ফুটুক্ গে
রোদ উঠেছে উঠুক্ গে
আমার তাতে কি।

আমি এখন উঠবো না
খেলার মাঠে ছুটবো না
পড়তে বসেছি।

জল পড়ছে পড়ুক্ সে
পাতা নড়ছে নড়ুক্ রে
আমি নড়ছি না।

বেল পাকলে কাকের যা
আমার এখন সেই দশা
কাল যে পরীক্ষা !!

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

এক

পাড়ায়-পাড়ায় ফিল্মী গানের মাইক বেজেছে
মাইনে-বোনাস উজাড় করে সবাই সেজেছে
হেথায়-হোথায় ছেলেমেয়ে নাচতে লেগেছে
আমার মনে তবুও কেন দুঃখ জেগেছে ?
দেশের বুকে হেথায়-হোথায় অসুর জেগেছে !
কে দেখেছে, কে দেখেছে, দুর্গা দেখেছেন
রাংতামোড়া বর্শাখানি সাজিয়ে রেখেছেন।



তুই

একটা পাখি, তিনটে পাখি, পাঁচটা পাখি,
আমার সঙ্গে এতোই তোদের মাখামাখি !
জানলা পেয়ে ঢুকলি ঘরে
আমি ভুগছি প্রবল জ্বরে
বলতো তোদের কোথায় বসাই, কোথায় রাখি ?
টেবিলে বই, চেয়ারে লোক,
বাড়ির লোকের মনে তো শোক,
কোথায় তোদের বসাই, দেবো আলনাটা কি ?

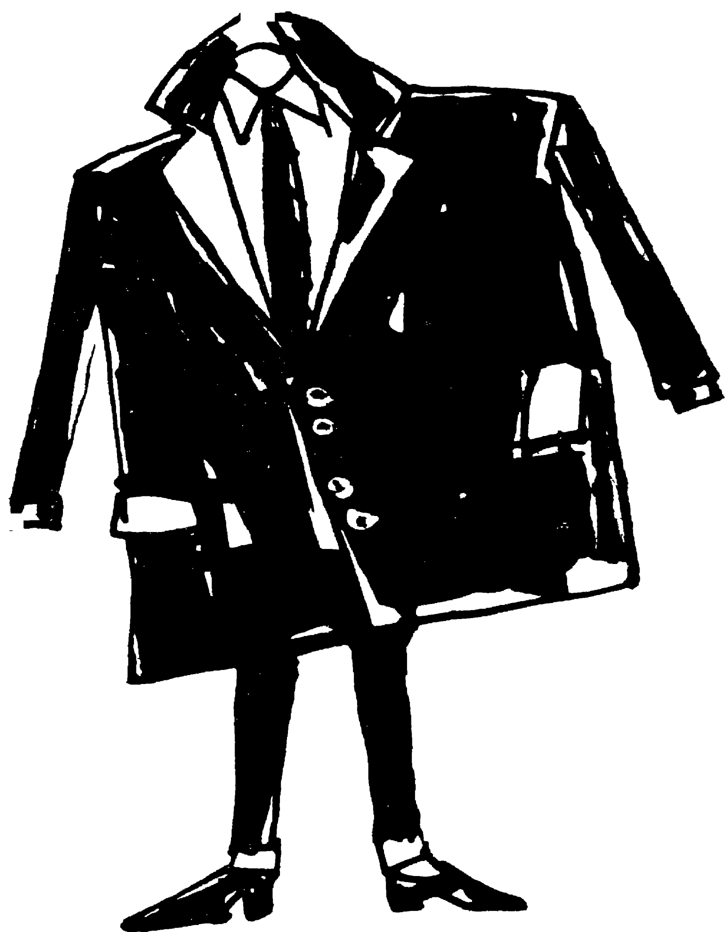
ছোট্ট ঘরে রোগবিছানা
সারবো কি-না তাও জানি না
পাখি, তোরা চলে যাস না
থামাস না ওই ডাকাডাকি ।

পাখি, আমার ইচ্ছে হচ্ছে মনে-মনে
তোদের সঙ্গে বনে-বনে
একলা থাকি ।

দাউদ হায়দার
দোষ

মামার বুকের দুঃখটাকে
বলতে আমার মানা।
শহর থেকে ঘুরে এসে
ভুলে গেছেন 'গানা'।

একটু চলেন এঁকে বেঁকে
একটু চলেন ব'সে
বাংলা ভাষা ভুলে গিয়ে
হিন্দী বলেন দোষে।



আমরা

চলে গেছে ইংরেজ
রয়ে গেছে তেজ
আমরা,
                সাহেবের ভাইপো
নীলকর নাম নয়
আমরা,
                'রাইপো'

বীতশোক ভট্টাচার্য

মীরা

মীরার বাড়ি বিরাটি
মীরাকে নাও মীরাটে
কাঁচপোকা নাও হীরাটি
দুখান করো করাতে।

কপাল পোড়ায় জোনাকি
ওড়াও আলো দুহাতে
হচ্ছে দেখাশোনা কী
মীরার মায়ের ভাড়াটে ?



ছায়া

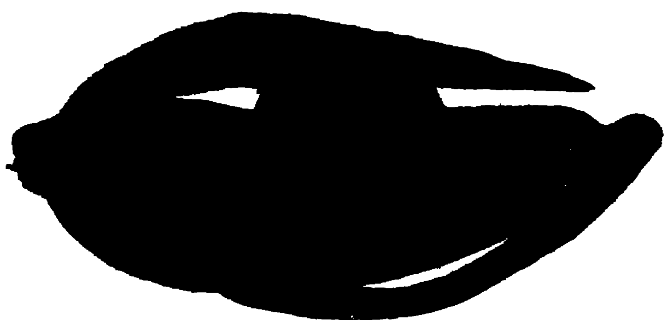
ছায়া কাঠবাদামের গাছে
ছায়া কাঠবেড়ালির আছে
ছায়া কুকুর গোলাপ গাছ
ছায়া লেলায় যে বাণ মাছ
ছায়া কামড়ে কাঠের ঘোড়া
ছায়া এক পা করে খোঁড়া
ছায়া কাঠের ঘোড়া যদি
ছায়া পার হতে চায় নদী
ছায়া ছল্‌বলে এক ছেলে
ছায়া দিস্‌রে পিঠে ফেলে।

ধীমান দাশগুপ্ত

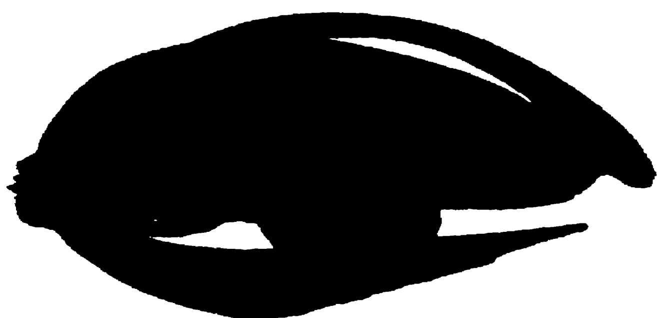
ছায়া

ছায়ায় ছায়ায় যেতে
ঘুমের আসন পেতে
দিব্বি হাতি ঘোড়া
ঘুম অঘুমে মোড়া
পাতার ভারে চোখ
ঘুম পাড়ালো লোক
ঘুম পাড়ালো খোকা
ঘুমঘুমিয়ার টোকা।

ঘুম



ঘুম ঘুম ঘুমানি
তপ্ত ভাতের আমানি
ঘুম ঘুম ঘুমানো
ওই আলো কি কমানো



ঘুম ঘুম ঘুমারি
এ ঘুম ছিল তোমারই
ঘুম ঘুম ঘুমিও
আমরা ঘুমাই, তুমিও
ঘুম ঘুম

ছড়ার আঙ্গিক

পূর্বজন্মের কথা যদিও বা জানে, নিজের জন্মমুহূর্তটিকে চেনে না মানুষ। ছড়ার সূত্রপাতের সময়টি তেমনি প্রাথমিক, সুদূর এবং প্রায়-বিস্মৃত। তবু প্রজননের বিজ্ঞান যেমন জন্মলগ্নের কল্পনার সহায়, তেমনি ছড়ার উদ্ভব ও বিকাশের ধারণায় তার রচনাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজনীয় হতে পারে। অথচ আপাত-উল্লম্ফন বা ছন্ন-অসঙ্গতি যেহেতু ছড়া তৈরির এক একটি সূত্র, তাই অসংলগ্নতাই ছড়ার একমাত্র সংবিধান—এমন একটি ধারণা সহজে সকলের প্রশ্রয় পায়। তবু উন্মাদনা প্রণালীবদ্ধ হতে পারে এবং ছড়াও হয়ে ওঠে রীতিমতো পাগলামি। জীবন্ত, স্বাস্থ্যকর এক পাগলামি, কিন্তু লোকপ্রজ্ঞার শাসনকে উপেক্ষা করে নয়।

ছড়ার প্রকরণকে যদি স্তরীভূত পদ্ধতির সমাবেশ ব'লে ধরে নেওয়া যায় তাহলে তার প্রথম পর্যায়ে থাকবে প্রত্নস্মৃতিবহ এক একটি অর্থহীন পংক্তি। ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি, ইচিং বিচিং জামাই চিচিং—এসব পংক্তিতে এই নিরর্থবাচকতা আছে। আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল, আপিলা চাপিলা ঘন ঘন মাসী—এসব নিরর্থবাচী পংক্তির অনেক শব্দ অবশ্যই চেনা। এ ধরনের পংক্তিকে ইতিহাসের উত্তরাধিকার হিশেবে দাঁড় করানোর একটা প্রয়াস পণ্ডিতদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। যেমন, বলা হয়ে থাকে, আগডোম বাগডোমের মধ্যে শুধু হ য ব র ল নেই, মধ্যযুগের অগ্র ও পশ্চাদ্বর্তী ডোমসেনার স্মৃতিও সক্রিয় হয়ে আছে। এ ধরনের উল্লেখ হয়তো বিচারসহ, তবু নিশ্চিতভাবে একে ইতিহাস বলা যায় না। কারণ ছড়া যদিও লোকসাহিত্য তবু প্রাচীন সাহিত্যমাত্রই লোকসাহিত্য নয়। ছড়ার মধ্যে ইতিহাসের অবিকল উপাদান না খোঁজাটাই তাই সমীচীন। আবার অন্যভাবে, ছড়ার মধ্যে বিদেশি উপাদানের অনুপ্রবেশ দেখিয়ে তার লৌকিক মূলটিকে দৃঢ়তর ক'রে দেখানোর আরেকটি প্রয়াস চলে। যেমন আইকম বাইকম তাড়াতুড়ির মধ্যে আই কাম উই কাম এসব ইংরেজি শব্দের স্মৃতি অবিকল কাজ করছে বলা যেতে পারে। এও

হয়তো সত্য, তবু সতর্ক হওয়া দরকার, কারণ ছড়ায় আদিবাসী গানের আঙ্গিক থেকে গেছে, তাহলেও ছড়া আদিবাসী গান নয়। অথচ আশ্চর্য এই, এক এক পংক্তির এই নিরর্থবাচক উপস্থাপন আদিবাসীদের গানের রীতির সঙ্গে বেশ মেলে।

এবার বলা যেতে পারবে যে প্রাচীন লোকগীতির মতো ছড়ায় এসব এক একটি অর্থহীন পংক্তির তাৎপর্যপূর্ণ সাংগীতিক ভূমিকা থেকে গেছে। অর্থ নয়, ধ্বনির বিচারে এসব পংক্তি বিবেচিত হওয়ার যোগ্য এবং বিশেষ মূল্যবান। ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি যে বিশিষ্ট সময়ের রচনা তখন বাঙালির প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট ধ্বনিগত ভারসাম্য এসে গেছে। স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সুনিয়ন্ত্রিত সমাবেশে এই পংক্তির সংগঠন। ই, ক, চ, ম, ড় এসব স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির আবৃত্ত প্রয়োগও এ আবহ তৈরির ব্যাপারে কাজে লেগেছে। ইচিং বিচিং জামাই চিচিং-এ আবহাওয়া গড়ে উঠেছে একটি আনুনাসিক ধ্বনির বাহুল্যে। এসব ক্ষেত্রে অর্থ না থাকলেও এসব পংক্তির ঐকিক ও আবেগগত মূল্য আছে, একটা অনির্দেশ্য ভাবের প্রতীক হয়ে ওঠার পক্ষে এ জাতীয় পংক্তির কোনো বাধা নেই। ছড়াকারের সেই বিশিষ্ট আবেগ ছড়াশুনিয়েদের মধ্যেও বিশেষভাবে সংক্রান্ত হয়ে পড়ে। অর্থহীন এক একটি পংক্তি ছড়ার মধ্যে অভিঘাত সৃষ্টি করে এভাবে।

সমগ্র ছড়ার শরীরে এ ধরনের অর্থহীন পংক্তির উপস্থাপনের একটি প্রায় নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যা তার ধ্বনিবাচকতার শর্তটিকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণত এ জাতীয় পংক্তি ছড়ার শুরুতেই বসে থাকে। ধ্বনিময়তা দিয়ে সূত্রপাত করে এ ধরনের ছড়ার সূচনা করা হয়। যেমন আদুড় বাদুড়, ইকড়ি মিকড়ি, আইকম বাইকম। স্পষ্টতই ধ্বনিনির্ভর কোনো কোনো ছড়ার সূচনা অংশ। যেমন : তাই তাই তাই, উলু উলু মাদারের ফুল, বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর শব্দ-দ্বিত্ব ও অনুকরণমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায় এ ধরনের পংক্তির মধ্যে। বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয় শেষ অংশেও যখন এ জাতীয় শব্দব্যবহার থাকে। যেমন : ডুগডুগি বাজাই, উঃ বড্ডো লেগেছে, তালগাছ পড়ে দুম্‌, তাকডুমাডুম ইত্যাদি। ছড়ার মধ্যে গানের ধুয়োর মতো এই ধ্বন্যাত্মক পংক্তি ফিরে ফিরেও আসে। যেমন নাকের বদলে নরুণ ছড়াটিতে উপকথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতি দুটি পংক্তিকে বিশ্লিষ্ট করে ধ্বনিবাচক তাকডুমাডুম

পংক্তিটি বসিয়ে দেওয়া হয়। এ রীতিকে প্রাচীন লোকগীতির রীতি বল যায়। ধ্বনিব বিস্তার হতে থাকে ছড়াটির মধ্যে ক্রমশ, শেষের দিকে ধ্বনি প্রবলতর হয়ে উঠে একটি অন্তিম ও চূড়ান্ত বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে থেমে যায় ছড়াটি সমাপ্ত হয়ঃ তাগুম তাগুম ডুম ডুমা ডুম/ডুম ডুমা ডুম ডুম।

এসব পংক্তি একা একা যথেষ্ট স্বাধীন, স্বাশ্রয়ী, তবু এদের ঘিরে বাধ্যতামূল অনুষঙ্গের একটি চাপ গড়ে ওঠে। এসব একাকীতম পংক্তিকে তার নিজস্ব ছড়ার পবিবেশ থেকে স্খলিত করে আনলে তার চরিত্র ভ্রষ্ট হয়। আধুনিক ছড়ায় প্রাচীন ছড়ার জোড়াতালি যে কানে লাগে, ঠিক সেই ধরনের রস যে তা খণ্ডিতভাবে উদ্রেক করতে সক্ষম হয় না, তা এইজন্যই। ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি-র সঙ্গে চাম কাটে মজুমদার অচ্ছেদ্য পুনরাবর্তনের সূত্রে গ্রন্থিত হয়ে যায়, তাকে কোনো ছলে আর কোনো ছড়ার সঙ্গে সংলগ্ন করা যায় না।

ছড়ায় এরকম এক একটি পংক্তিকে এ সমীক্ষায় একক ধরা হয়েছে। পূর্বোক্ত নিরর্থক ধ্বনি সমবায় নিযে এক ধরনের একক তৈরি। আরেকরকম একক আছে যেখানে ধ্বনিময় পংক্তি নয়, অর্থবহ পংক্তি বর্তমান। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থযুক্ত শব্দবহ এক একটি বাক্য নিয়ে এই ধরনের এক একটি পংক্তি গঠিত। এই পংক্তি একাগ্র, সরল, সংহত ও বিবৃতিময়। অর্থাৎ ছড় সামগ্রিকভাবে অসংলগ্ন মনে হতে পারে কিন্তু এ ধরনের শব্দসমবায়ে রচিত এক একটি পংক্তির মধ্যে রীতিমতো ব্যাকরণগ্রাহ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ অন্বয় আছে। এখানে বাক্য প্রসঙ্গে ব্যাকরণগ্রাহ্য কথাটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের সমর্থন পাবে। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসক্তির তিনটি শর্ত পূরণ না করেও, চোমস্কি দেখিয়েছেন, সাধারণের কাছে অর্থহীন শব্দসমষ্টি ব্যাকরণগতভাবে নির্ভুল বাক্য গঠন করতে পারে।

এ ধরনের অর্থবহ একক পংক্তি যিনি ছড়া কাটেন তাঁর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিরর্থক পংক্তির সঙ্গে যেমন গানের যোগ, অর্থময় পংক্তির সঙ্গে তেমনি নাচ যুক্ত। ছড়া/নাচ সেখানে অবশ্যই কেবল সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য নয়, তার যোগ তখন শিল্প ও আনন্দের সঙ্গে। লোকশিল্পের স্বভাবেই এই নান্দনিক চরিত্রলক্ষণ আছে, লৌকিক প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়েও সেখানে আনন্দের অলৌকিকতাকে গ্রহণ করা যায়। বাউল গানে বাউল নিজেই গান এবং নাচেন, কীর্তনিয়াও তাই। ছড়া কাটেন মা, নাচেন তাঁর শিশু।

আদি ও অন্তিম পংক্তিটি ছড়ায় তাই প্রায়শ নৃত্যপর হয়ে ওঠে: তাই তাই তাই। ডালিম গাছে পরভু নাচে। খোকার নাচন দেখে যা। ছেলেটি তুড়ুক নাচে। ফ্যান গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে।

মন্ত্র ও ম্যাজিকের মধ্যে একপংক্তিক নিরর্থক ধ্বনিসমষ্টির যে উদাহরণ পাওয়া যায় তা ছড়ার মধ্যেও মেলে। তাছাড়াও কিছু প্রার্থনাসূচক ও অভিচার-ব্যঞ্জক এক পংক্তির অর্থবহ একক আছে ছড়ার মধ্যে। ছড়ার সঙ্গে ধর্মের সুদূর এবং ক্ষীণ হলেও একটা যোগসূত্র ছিলই। এই ধর্মীয় অনুষঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় বিশেষ করে ব্রতকথার ছড়াগুলোর মধ্যে। ছড়ায় একপংক্তিক অর্থবহ এককগুলো এভাবে অনেকসময় এক একটা রিচুয়ালকে ধরে রেখেছে।

সম্বোধনবাচকতা এ ধরনের পংক্তির একটা সাধারণ লক্ষণ। মূলত মানুষকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলা হয় ছড়াগুলোয়। আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই। একটি শ্রেণী এখানে উদ্দিষ্ট। আয় বুড়ি ঢাকা/তোকে দেবো টাকা, এখানে উদ্দিষ্ট একটি শ্রেণীর এক প্রতিনিধি, যে কোনো বুড়ি। নামবাচকতার ফলে সম্বোধন একটি নির্দিষ্ট সামাজিকতায় অন্বিত হয়ে ওঠে: আয় লবঙ্গ হাটে যাই। পারিবারিক সূত্রের বন্ধন ছড়ার সঙ্গে এই সূচক বাক্য বা বাক্যাংশকে সংলগ্নতা দেয়।—দাদাভাই, চালভাজা খাই। মাগো মা, তোমার জামাই এসেছে। বড়ো বৌ গো, রান্না চড়া। হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি। —এ সব এই জাতীয় উদাহরণ। বৃহত্তর অর্থে নিসর্গও এখানে মানবপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। হ্যাদে লো কলমিলতা, ওরে ভোঁদড় ফিরে চা-র মধ্যে উদ্দিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী। কোথাও কোথাও সম্বোধনের পাত্রর হদিশ মেলে না; সেখানে সাধারণভাবে শ্রোতা/শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে এরকম ধরে নিতে হয়।

এই সম্বোধনবাচকতার অনুষঙ্গে আবাহনের একটি স্পষ্ট ভঙ্গি ফোটে ছড়ার এক এক পংক্তিতে। এই ভঙ্গির মধ্যে আছে অভিচারমূলকতা। শব্দ-দ্বিত্ব বা পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রার্থনা বা অভিচারের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। যেমন, আয় ঘুম আয়/বাগদিপাড়া দিয়ে। আয় রে আয় টিয়ে/নায়ে ভরা দিয়ে। আয় আয় চাঁদামামা/টী দিয়ে যা। বকমামা, বকমামা ফুল দিয়ে যা। পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো গে। কোনো কোনো পংক্তি স্পষ্টতই আদিম কৌম অভিচারের স্মারক: আয় বিষ্টি হেনে/ছাগল দেবো মেনে। আয় রে আয়

নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। প্রাচীন লোকবিশ্বাসের সঙ্গে এসব পংক্তির যোগ খুব বেশি ঘনিষ্ঠ।

অনুরূপ সব পংক্তির ভিন্নতর এক প্রসঙ্গ হলো ট্যাবু। রূপকথার মতো ছড়াতেও আছে কিছু মাননীয় নিষেধ: ও বেগুনটা কুটো না, বীজ এসেছে।/ ও দুয়ারে যেয়ো না বধূ এসেছে। এ নিষেধ কোথাও কোথাও সাধারণ নেতি-বাচক অনুজ্ঞায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে: জল আনতে খুকুমণি যায় না যেন আর। আবার কখনো কখনো তা প্রবল প্রত্যাহারে রূপায়িত: কানকাটার মা আসিস না/বড় ছুরি শানাস না। আসিস না রে জুজুমানা/গোপাল ঘুমিয়েছে। ভয় ও তার পরিপূরক আশ্বাস আছে এসব পংক্তির মধ্যে। আবার কখনো তা ভীতিজনকতায় পর্যবসান পেয়েছে এমনও দেখা যায়: আবার যদি কাঁদো তবে ঝোলায় ভরে নেবো।

আদিম গানে যেমন সক্রিয়তা সংগীতের একটি আলাদা বিভাগ তৈরি করে, তেমনি ছড়াতেও প্রবল ক্রিয়াবাচকতা আছে। বাংলা কবিতা যেহেতু স্বভাবতই ক্রিয়ার লক্ষণে দীন সেজন্য ছড়ার এই ক্রিয়াপ্রাচুর্য বিস্ময়কর। ছড়ায় এক একটি পংক্তি যেহেতু এক এক বাক্যের অর্থবহ একক তাই সক্রিয় শব্দগুলো অন্বয়গত পারিপাট্য অনুযায়ী এখানে বিশিষ্ট স্থান পায়। সুলভ ক্রিয়াপদের অনেক মিল সমগ্র ছড়াটিতে সাবলীল ও অবিরল ব্যবহার পেয়ে থাকে: চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে॥ হাতি নাচছে। ঘোড়া নাচছে। একটি ছড়ায় এরকম সহজ ও অজস্র ক্রিয়াপদের ব্যবহার। আবার মারব চাবুক, চড়ব ঘোড়া এ জাতীয় পংক্তিতে ক্রিয়ার তুলনামূলক প্রাধান্য প্রাচীন বাংলা ভাষার গোত্র স্মরণ করিয়ে দেয়।

এক পংক্তির বাক্য অন্তর্মিলের সুযোগ নেওয়ায় ছড়ার ছন্দের রীতিটি আরো স্পষ্টতরো হয়ে ওঠে। এই ছন্দের রীতি একটি পংক্তির দুটি খণ্ডে একই সঙ্গে ভারসাম্য ও সংসক্তি এনে দেয়। পৃথিবীর সব প্রাচীন ছড়াতে অল্পবিস্তর মিল আছে, বাংলার ছড়াকারেরা তবু কখনোই মিলের সম্ভাবনাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলতে চান না। ছড়া তাই, আর যাই হোক, কবিগান নয়। তবে ছড়ায় মাঝে মধ্যেই এক পংক্তির বাক্যে অন্তর্মিল বেজে উঠছে শোনা যায়। এর মধ্যে কিছু মিল আসে নিছক ধ্বনিঝংকারের জন্য: ফিং ফিঙেটি বাবুইহাটি। টঙ্কা ভেঙে শঙ্কা দিলাম। সরল পথে তরল গাছ। আবার কিছু ভেতরের

মিল শুধু ক্রিয়াবাচকতা দিয়ে বুনে দেওয়া হয়ঃ খাবি দাবি কলকলাবি। চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে। খোকা ঘুমুল, পাড়া জুড়ুল। আর কোথাও ধ্বনিসাম্য নেহাৎ প্রয়োজনে আসে, এসে পড়েঃ আতা গাছে তোতা পাখি। পাঁকাল মাছের কাঁকাল সরু। উড়কি ধানের মুড়কি দেব। কোথাও কোথাও এই অন্তর্মিলের প্রয়োগ এমন সাবলীল ও অনায়াস যে তা চোখেই পড়ে নাঃ মাসির বাড়ি ভারি মজা। কবিতার মতো জটিল অন্তর্মিল দেওয়া হয় এখানে। শব্দের মধ্যখণ্ডনের এমন একটি দৃষ্টান্তঃ ইস্টিশানের মিষ্টি কুল। এই অন্তর্মিলের সহায়তায় ছড়ার এই পংক্তিগুলি কবিতার রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়ঃ নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে। পরনেতে ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।

ছড়ার ছন্দের একটি বিশিষ্ট রীতি গঠনে এক পংক্তিক অর্থবহ বাক্যে যুগ্ম শব্দ একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে দেখা যায়। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝম। এরকম ধ্বন্যাত্মক জোড়াশব্দ আছে এসব ছড়ায় খুব বেশি রকম। আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে। ঝাড়-লণ্ঠন জ্বেলে দেব আলোয় আলোয় যেতে। এরকম বিশেষ্যের শব্দদ্বিত্ব ঘটেছে কোথাও কোথাও। ক্রিয়াপদের যুগ্মতাও লক্ষ করার মতোঃ এ মাসটা থাকো দিদি কেঁদে ককিয়ে। নেড়ে-চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে। অনুসারী শব্দের সহযোগও রয়েছে এর মধ্যেঃ মাসি পিসি বনগাঁবাসী। কাপড় দিলাম চোপড় দিলাম। একই পংক্তির মধ্যে একই পদবন্ধ ফিরে ফিরে আসছে এমনও দেখা যায়ঃ কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে। ওই আসছে, ওই আসছে মাঠ আলো করে। বস্তুত বাংলা শব্দবিন্যার বিশিষ্ট ও প্রধান সূত্রগুলো এখানে নানাভাবে অনুস্যূত হচ্ছে দেখা যায়।

ছড়ায় এক পংক্তিক বাক্যরচনার বিশেষ পদ্ধতি ছড়ার প্রসঙ্গকে নান্দনিক অভিঘাত দেয়। জিজ্ঞাসার নেতিবাচকতা থেকে উত্তরের সদর্থকতায় পৌঁছনোর সুযোগ থাকে কোনো কোনো ছড়ার এক একটি পংক্তিতে। ধান খাবো না, পান খাবো না, খাবো সরের নাড়ু। খাট নাই পালং নাই চোখ পেতে বস। ভারসমতার এই বোধ ছড়ায় এক ধরনের অ্যামবিভালেন্স নিয়ে আসে। দুই দিকে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে। এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।—এসব এইরকম সমদ্বিধাময় পংক্তি ছড়ার অন্তর্লীন টানা-পোড়েনের একটি স্পষ্ট জমি তৈরি করে।

তৃতীয় পর্যায়ে ছড়ার একটি পংক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে তার পরের আরেকটি পংক্তির স্বাধীনতা যুক্ত হয় এবং এই স্বনির্ভর দ্বিপদীর এককটি এক স্বাশ্রয়ী শ্লোক গঠন করে। ছড়ার দু পংক্তির একককে এখানে শ্লোক বলা হয়েছে। এই অর্থে শোলোক শব্দটি এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত। একটি শ্লোকে একটি পংক্তি তার প্রসার ও বিস্তার চায়, ফলে টানেটানে আরেকটি পংক্তি চলে আসে। দুটি পংক্তি এখানে সমান সম্মানিত, দুটি পংক্তিতে তুলনামূলকভাবে একই অভিঘাত, তবু মনে রাখতে হয় স্বতন্ত্র শ্লোক হিশেবে দুটি পংক্তি এক তাৎপর্যপূর্ণ একক। শ্লোক সংগঠনের দিক থেকেও একটি স্বাভাবিক এবং সুবিধেজনক একক।

এক পংক্তির অর্থবহ বাক্যে পুনরাবৃত্তির যে পূর্বোক্ত সম্ভাবনা ছিল শ্লোকের এককটিতে তাকে আরো দৃঢ় করে তোলা হয়। পুনরুক্তি ব্যবহৃত হয় অভিঘাত সৃষ্টির জন্য, আবিষ্ট করার জন্য। আপাত-অসংলগ্ন ছড়ার মধ্যে আম্রেডন (রেকারেন্স) এভাবে সংলগ্নতার একটি সূত্র বয়ন করে দেয়। দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি/চাল কাঁড়িতে হল বেলা/ভাত খাওসে দুপুরবেলা/ভাতে পড়ল মাছি/কোদাল দিয়ে চাঁছি/কোদাল হল ভোঁতা—এভাবে পূর্বানুবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে দ্বিপদীগুলো পরস্পরসংসক্ত হয়ে উঠছে বোঝা যায়। মিলের দিক থেকে দ্বিতীয় পংক্তির অতিরিক্ত অথচ অনিবার্য প্রয়োজনকে স্বীকার না করে প্রথম পংক্তি পারে না। স্বরধ্বনি, আনুনাসিক দীর্ঘায়ত ও দ্রুতহ্রস্ব উচ্চারণ পুনরাবৃত্তি নিয়ে আসে এবং ছন্দের রীতির গোড়ার কথা এই আবর্তন। কিন্তু শ্লোকে ঈষৎ পরিবর্তিত দ্বিতীয় পংক্তিটি শুধু ছন্দোরীতিকেই নিয়মিত করে না, তার প্রসঙ্গকেও অনুপূরক/পরিপূরক ভারসাম্যের সম্পূর্ণতায় নিয়ে যায়।

বোধের এই সামগ্রিকতা রূপ পায় শ্লোকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। সংলাপের ভঙ্গি শ্লোকের এককটিতে নাটকীয়তার আমেজ নিয়ে আসে। এক একটি শ্লোক আছে যা প্রশ্ন ও উত্তরে টানটান এবং সেই টানাপোড়েন ছড়ার ছন্দের রীতিকে বাক্‌চালের কাছাকাছি নিয়ে এসেও কাব্যময় করে তোলে। সংহত সংক্ষিপ্ত দ্রুত সংলাপরচনার মধ্য দিয়ে কোনো কোনো ছড়ায় শুরু ও শেষ হয়। যেমন : ওখানে কেরে ? আমি খোকা। / মাথায় কি রে ? আমের ঝাঁকা। ইত্যাদি। আবার এক ধরনের ছড়ায় একটি সূচক শ্লোকের পর প্রশ্নের পরে প্রশ্নের মালা গাঁথা হয়ে থাকে। এরকম পরম্পরিত প্রশ্নমালার

তিনটি জনপ্রিয় উদাহরণ দেওয়া গেলো : আমার কথাটি ফুরুলো/নটে গাছটি মুড়ুলো। তারপরই প্রশ্ন শুরু হলো : কেন রে নটে মুড়ুলি? ইত্যাদি। দিদি লো দিদি, একটি কথা। তারপরই কি কথা? ব্যাঙের মাথা। এভাবে প্রশ্নের ধারা চলতে থাকে। ঘুগু সই, বাসা কই? শিমুল গাছে। তারপরই গাছ কই? ছুতোর নিচে। এ জাতীয় শ্লোকে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে এক/একাধিক এক জাতীয় শব্দ ফিরে ফিরে আসে। এতে চিন্তার সংলগ্নতা যেমন প্রসঙ্গগতভাবে বজায় থাকে তেমনি পদ্ধতিগতভাবেও আবৃত্ত প্রয়োগে এক ধরনের নিরবচ্ছিন্নতা সূচিত হয়। এর পাশাপাশি এক পংক্তিক প্রশ্ন ও এক পংক্তিক উত্তর একটি বিচিত্র শ্লোকের একক গঠন করে। এর মধ্যে কোনো কোনো শ্লোক প্রথাগত, প্রশ্ন ও তার আনুষঙ্গিক সঠিক উত্তর নিয়ে এসব দ্বিপদীর গঠন। পুঁটু নাচে কোনখানে? শতদলের মাঝখানে॥ বর আসছে কতদূর? বর আসছে বামুনপাড়া॥ এসব জিজ্ঞাসার পিছনে আছে গল্প। অন্যভাবে বলা যায়, নাটক কাব্য কথাসাহিত্য সবকিছুর মূলে আছে এই শাশ্বত কৌতূহল। হাদে লো কলমিলতা/এতকাল ছিলি কোথা? এক পয়সার তৈল/কিসে খরচ হৈল? এসব জিজ্ঞাসার পিছনে ওই মানবিক কৌতূহল সক্রিয়। কোথাও আবার প্রশ্ন ও উত্তরের পরম্পরার মধ্যে কোনো সঙ্গতি নেই এমনও দেখা যায়। যেমন, প্রশ্ন : ফিংফিঙেটি বাবুইহাটি/কোনখানে তোর বাসা? এবং উত্তর : আমার জাদুর বিয়ে হবে/বউটি হবে খাসা। কোথাও প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি উচ্চারিত, বক্তার কণ্ঠস্বরেই তা অনুমেয়, তবু তারও উত্তর দেওয়া থাকে ছড়ার মধ্যে। ধনকে নিয়ে বনকে যাব/আর করব কি?/চুপটি করে বসে ধনের/মুখটি নিরখি। আবার কোথাও প্রশ্নটি অনুক্ত, কিন্তু উত্তরের ধরন দেখে স্থাপনীয় প্রশ্নটিকে খুঁজে পাওয়া যায় : নাই নাই ভাই, মা সরবাড়ি যাই/মাসির বাড়ি ভারি মজা/ কিল চড় নাই।

মিথের সঙ্গে ছড়ার প্রসঙ্গগত যোগ এই শ্লোকে এসে স্পষ্ট হয়। সংস্কৃত ও প্রাচীন পুরাণের লৌকিক টানটোন এখনো এইসব ছড়ার শরীরে অনতি-উচ্চারিত হয়ে রয়েছে। তুমি নাও বংশী হাতে/আমি নিই কলসী কাঁকে। এই শ্লোকের পটভূমিতে আছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম। স্বপনের খাড়ু নারে এ যে দেখি বাং/কোথা গিয়ে পাব আমি পদ্মাবতীর গাং—এর মধ্যে চাঁদসদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার উল্লেখ নিহিত হয়ে আছে। আগমনী বিজয়া/চণ্ডীমঙ্গলের পৌরাণিক

স্মৃতিবহ শ্লোকও চোখে পড়ে : তালগাছ কাটম বোসের বাটম, গৌরী হেন ঝি তোর কপালে বুড়া বর, আমি করবো কি।'

শ্লোকে এসে কথাসাহিত্যের সঙ্গে ছড়ার গাঁটছড়া বাঁধা হয়। রূপকথার অবশেষে অনিবার্যভাবে এই দ্বিপদীটি উল্লিখিত হয় : আমার কথাটি ফুরুলো/নটে গাছটি মুড়ুলো। বিশেষ করে এই জাতীয় ছড়ার কাহিনী সংবিধানের প্রবণতা লক্ষ করার মতো। তাঁতীর বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা/খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না। এ হলো পাকা হাতের লিখিয়ের গল্পের সূচনা। কনকাবতী মাগো/ঘরকে এসো নাগো-এর মধ্যেও গল্পের কৌতূহলী উপাদান লুকোনো নেই। উপকথাগুলোও ছড়ার ভিত্তিকে আশ্রয় করেছে। শেয়াল-আশ্রয়ী পূর্ববঙ্গের একটা উপকথার প্রায় আস্ত কঙ্কাল খুঁড়ে পাওয়া যাচ্ছে এই দুটি দ্বিপদীর মধ্যে : এক যে আছে শেয়াল/তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল/তার বাপের নাম রতা/ফুরোল আমার কথা। রূপকথার বিশিষ্ট সূচক পদবন্ধ 'এক যে আছে' ছড়াতেও ব্যবহৃত হচ্ছে এও খেয়াল করার মতো। গণনাকে আশ্রয় ক'রে কোনো কোনো ছড়ার প্রসঙ্গ গড়ে উঠেছে। এর সবচেয়ে ভালো নমুনা হিশেবে এই দ্বিপদীটিকে পেশ করা যায় : ষোলো কৈ ষলুয়ে/দুটো গেল তার পালিয়ে।

অন্তর্মিল-যুক্ত দ্বিপদীগুলোর মধ্যে ত্রিপদীতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বাংলার ত্রিপদী ছন্দের রীতি প্রকৃতপক্ষে দ্বিপদী/পয়ার ছন্দের রীতির সম্প্রসারণ এর প্রমাণ এভাবে ছড়ার মধ্যে নিহিত থেকে গেছে : ধনকে নিয়ে বনকে যাব/আর করব কি। চুপটি করে বসে ধনের/মুখটি নিরখি। এখানে করব-কি/নিরখি-র নিপুণ চরণান্তিক মিল তো আছেই, তা ছাড়াও ধনকে/বনকে এবং চুপটি/মুখটি শ্লোকটিকে একই সঙ্গে দোলা ও ভাবসাম্য এনে দিয়েছে। ছড়ার এক পংক্তির একক যে আরেক পংক্তির স্বাধীন সম্প্রসারণ একথা এখানে নতুন করে মনে পড়ে।

একটি শ্লোকের মধ্যে থাকে একটি ভাবভাবনার বীজ। পরের পংক্তি প্রয়োজন হয় তার প্রাসঙ্গিক বিস্তারের জন্য। আবার সেই ডালপালাকে জলহাওয়াবোদে হাত পা মেলে দেওয়ার জন্য আরো একটি পংক্তি জরুরি হয়ে পড়ে : এভাবে গঠিত হয় আরেকটি স্বাধীন শ্লোক। পূর্বের এই প্রক্রিয়ায় পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকের স্তরীভূত বিস্তার এভাবে ছড়ার সম্পূর্ণ ভূমি তৈরি

করে দেয়। অর্থ ও অন্বয়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ একটি শ্লোকের সঙ্গে এভাবে আরো আরও শ্লোক যুক্ত হয় এবং সমগ্র ছড়াটি এক আকর্ষণীয় অথচ পরিমিত ঐক্যে সংবদ্ধ হয়ে থাকে।

ছড়ার প্রারম্ভিক শ্লোকটিতে সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গকে উপস্থিত করা হয়। তার পরে পরে শ্লোকগুলি প্রসঙ্গগতভাবে সেই বিষয়কে যেমন বিস্তৃত করে, তেমনি নতুন পলকাটা উজ্জ্বলতার আভায ঝলসে ওঠে তারই মধ্যে, প্রকাশভঙ্গিমার সূক্ষ্মতা ক্রমপ্রকাশিত হয়। একটি প্রসঙ্গ আরেকটি প্রসঙ্গে চলে যায় এভাবে, একটি অভিঘাত পরের শ্লোকে নতুন একটি অভিঘাত তৈরি করে এবং এই দাঁতঅলা চাকার পারস্পরিক ধাক্কায় ছড়াব জলবিদ্যুৎ তৈরি হয়। পৃথকভাবে ছডার শ্লোকগুলি বিন্যস্ত হলেও সব মিলিযে পরম্পরাব একটি অভিঘাত থাকে বলে থিমের পবিবর্তন ছডায় কখনো আকস্মিক মনে হয় না। পরবর্তী শ্লোকগুলির আনুষঙ্গিক বিস্তার ছড়াটিতে ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আসে কোথাও, আবার কোথাও সামাজিক পটভূমিকায় মূল প্রসঙ্গটিকেই যথাযথভাবে স্থাপন করে। একটির সঙ্গে আরেকটি অতিবিক্ত একক শ্লোকেব যোগে এভাবে ছড়ার বিষয়টি ক্রমে জটিল ও বহুলাঙ্গ হয়ে ওঠে এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহাব যোগ্যতা পায়।

ছডার শ্লোকসমূহ একটি জটিল মনোভাবেব সরল বুনুনি তৈবি করে সব মিলিয়ে। ছডার এক পংক্তিতে পুনরাবৃত্তির যে সম্ভাবনা নিহিত সমগ্র ছডায় তা একইরকম পরিণতি পেতে পাবে না। একটি শ্লোক ধ্বনিগত ও প্রসঙ্গগত ভাবে পবেব শ্লোকটিতে ফিরে আসে, কিন্তু ফেরে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে এবং তার ফলে এই বিবর্তনকে ক্রমাগত বিচিত্র মনে হতে থাকে। পাঁকাল মাছের কাঁকাল সরু/মেয়েটি যেন কল্পতরু। পাঁকাল মাছেব কটিদেশ কৃশ। এই অনুষঙ্গে ক্ষীণমধ্যা মেয়েটিকে মনে পড়ে। তবু অনুষঙ্গ একটিমাত্র নয়। পাঁকাল মাছ ধরা দেয় না সহজে। পাঁকাল মাছের মতোই অ-ধরা ওই কৃশোদরী মেয়েটি। তাকে কল্পতরু বলার মধ্যেই ব্যঙ্গে ও বেদনায সে কথাটি স্পষ্ট। মধ্যে ক্ষামা মেয়েটিব অপ্রাপণীয় নারীস্বভাব এই শ্লোকটিতে যেভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠলো তেমনটি আর কিছুতে হতো না। এই অন্তর্লীন ভাবসাম্যে, এই স্বাভাবিক বিন্যাসে একটি শ্লোকের সঙ্গে আরেকটির মিল।

পুনরাবৃত্তির প্রবণতা ছড়ার শ্লোকসমূহে সমান্তরায়ন সৃষ্টি করে। নতুন কিছু

মিল, কিছু অপ্রত্যাশিত চেনার চমক ঝিলিক দিয়ে ওঠে এ জাতীয় পংক্তিতে। চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা। খোকার কপাল চাঁদের কপাল হয়ে যায় সে মুহূর্তে, চন্দ্র আবাহন একটি রিচুআলের মর্যাদা পায়। এই সমান্তরাল উল্লেখের ক্রমিক বিস্তারের প্রবণতাও ছড়ার প্রকরণকে বিশিষ্ট করে তোলে। চার কালো দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ : এই সূচক প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি ক'রে তিনটি কালো বস্তুর বর্ণনা পেরিয়ে নারীর কেশের বর্ণনায় এই সমান্তর উল্লেখ সমাপ্ত হয়। একটি স্তবকবন্ধের আদলও ফুটে ওঠে সেই সঙ্গে।

পুনরাবৃত্তির সূত্রটিকে প্রসারিত ক'রে বলা যায় ছড়ার ছন্দের বিশিষ্ট আম্রেড়নের রীতিই ছড়াটিকে অনিবার্য সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। যেমন : হাট্টিমা টিম টিম/তারা মাঠে পাড়ে ডিম/তাদের খাড়া দুটো শিং/তারা হাট্টিমা টিম টিম। এ ছড়ায় কিম্ভূত জন্তুটিকে উৎকল্পনা যতদূর না গড়ে তুলেছে তার চেয়ে বেশি প্রাণ দিয়েছে মিল। টিম-এর পরে ডিম, ডিমের পরে শিং—এ রকম না মিলিয়ে থাকতে পারা যেতো না। এবং আবার টিম-এ ফিরে এসে বৃত্ত সম্পূর্ণ করাও দরকারি ছিল।

পূর্বানুবৃত্তির এই স্বভাব বাঙালির কৌম অবচেতনায় ছড়ার সংস্কারগুলিকে আর্কেটাইপ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। পর্যাপ্ত পাঠভেদ ছাড়াও ছড়ার মধ্যে এমন সব প্রায়-অপরিবর্তিত/ঈষৎ পরিবর্তিত প্রতিরূপায়ণ আছে যা আলোচককে নতুন ক'রে ভাবায়। এক সুরে ভিন্ন ভিন্ন স্বর আরোপের মতো নতুন লাগে থিমসংক্রান্ত এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এবং তাই তা কখনো নীরস, ক্লান্ত, প্রথাসিদ্ধ ও একঘেয়ে মনে হয় না। পাশাপাশি দুটি ছড়া থেকে নমুনা গৃহীত হলো—

ক. ১. কাজিফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারামের খেলা॥

২. বকুল ফুল তুলতে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা।
রামশালিকের বাত্যি বাজে, তুলারামের খেলা॥

খ. ১. আজ বধূর গায়ে হলুদ, কাল বধূর বিয়ে।
বধূকে যে নিয়ে গেল বকুলতলা দিয়ে॥

২. যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥

ছড়ার প্রকরণে পুনরাবৃত্তির এই নিরবচ্ছিন্নতা নতুন করে প্রমাণ করে যে ছড়ার উপজীব্য বিষয় কোনো স্থির পরিস্থিতি নয়, তা হয় কোনো বিবর্তিত ঘটনা। ক্রিয়াপদের অজস্রতা, ক্রিয়ার দ্রুতকাল পরিবর্তন এবং চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে দৃশ্যসংস্থাপনের অস্থির অগ্রগতি ছড়ার শৈলীকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে। প্রতিটি চিত্রকল্পই এখানে দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে উপস্থিত হয়, তবু প্রত্যয়ী পরের চিত্রকল্পটিকে স্থান করে দিয়ে তা আবার সরে চলে যায়। বিচিত্র সক্রিয়তা ছড়ার মধ্যে এভাবে একটিই অর্থবহ। খুকু গেছে জল আনতে—এ ছড়াটিকে সম্পূর্ণত এ সমীক্ষার আওতায় আনা যেতে পারে।–

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। সূর্য পাটে গেল এইমাত্র। খুকু পদ্মদীঘির ঘাটে জল আনতে গেছে। তিনটি পংক্তির তিনটি ক্রিয়াবাচক শব্দ একটি ছবিকে স্পষ্ট করে তুলছে। ছবিতে রং একাধিক। সূর্যাস্তবেলার রক্তাভ ধূসরিমা, আসন্নবর্ষণ মেঘের নীলাভ কালো রং পদ্মদীঘির কালো জলকে আরো কালো করে তুলেছে। কিন্তু তারপরেই দেখা যায় কালো জলে হরেক রকম ফুল ফুটেছে। অর্থাৎ পদ্ম নয়, জলে জেগে আছে বিচিত্র বর্ণিলতা। পরের পংক্তিতে আবার মুছে গিয়েছে সেই রং : হাঁটুর নিচে খুকুর গোছাভরা কালো চুল দুলছে আবার। দুলছে এই ঘটমান বর্তমানেও ছবিটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, এরি মধ্যে তা বৃষ্টি আসার স্বাভাবিক সম্ভাবনায়. খুকুর ভিজে যাওয়ার ভাবী উদ্বেগে এবং তার ভিজে চুল শুকোনোর অনতিদূর ভাবনায় পৌঁছে গিয়েছে। অথচ প্রথম পংক্তিতেই মেঘ করেছিল, সূর্য ডুবে গেছিল, কাজেই খুকুকে তখন না যেতে দিলেই হতো। কিন্তু তা হলো না। খুকুকে জলের কাছে পৌঁছে দিয়েই বলা হলো . জল আনতে খুকুমণি যায় না যেন আর। এখানে সরল ছড়াটির সবচেয়ে জটিল গিঁট, সবচেয়ে দুরূহ হেঁয়ালি। জল খুকুকে আনতে হবেই, কিন্তু জলে তার ভেজা চলবে না। যে জল সে আনতে যাবে সে জল আসবে আপনা থেকে। বৃষ্টির জল আনার জন্য খুকুর জল আনতে যাওয়া, এভাবে ছড়াটি একটি রিচুআলের পর্যায়ে চলে যায়। ফ্রেসার সাহেব উল্লেখ করেছিলেন, আদিবাসী সমাজে বৃষ্টি আবাহনের জন্য কেশবতী কন্যাদের ব্যবহার কতো ব্যাপক। এ ছড়ায় জল-না-আনা বা চুল-না-ভেজানো এক একটা ট্যাবু—এবং এই পরিবর্তন আদিবাসী সংগীত থেকে ছড়ার বিবর্তনকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে। প্রকরণের মধ্যেও তার চিহ্ন থেকে যায়, খুকুসোনা

খুকুমণি হয়ে যান। বিষ্টি এলে ভিজবে সোনা, চুল শুকানো ভার। জল আনতে খুকুমণি যায় না যেন আর।

এভাবে সক্রিয়তা ও ছড়ার প্রসার পরস্পর সমানুপাতিক। তাই খোকার নাচের ছড়াগুলো খোকার ছোটো কচি পায়ের মাপের সঙ্গে তাল রেখে চার/ছয় পংক্তির। এবং নাচই এসব ছড়ার একতম ব্যাপার বিষয়: আয়রে আয় টিয়ে/নায়ে ভরা দিয়ে। থেনা নাচন থেনা/বটপাকুড়ের ফেনা। এ জাতীয় উদাহরণ। নৃত্যকলার মধ্যে যে সরলতা, পুনরাবৃত্তি ও সংসক্তির সৌন্দর্য আছে ছড়াতেও তা সংক্রান্ত হয়। ফলে ছড়ার শ্লোকসমবায়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সংসক্ত বিভাগ, তা একটি আদ্যন্ত চক্রে পরিণতি পায়। চক্র বৃত্ত নয়, তার মধ্যে আদ্যন্ত গতির নির্দেশ ও চাপ থেকে যায়। এবং তথাকথিত সামগ্রিক মানুষ নয়, মানুষের সামগ্রিকতাই যেহেতু ছড়ার অন্বিষ্ট, তা-ই তার আশ্চর্যরকম আধুনিক প্রকরণের মধ্যেও থাকে নিবিড় একাকিত্ব, উন্মত্ততার প্রণালী।

বীতশোক ভট্টাচার্য